প্রথম অধ্যায়

কালকূটের ব্যক্তিসত্তার পরিচয়

কথাশিল্পী কালকূটের আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল 'ভোটদর্পণ' নামে ছোট একটি রাজনৈতিক লেখার মধ্য দিয়ে। সেই আত্মপ্রকাশটি ঘটেছিল ১৯৫২ সালে। আর 'কালকূট' স্রষ্টা সমরেশ বসুর প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল ১৯৪৬ সালে দাঙ্গা-বিধ্বস্ত ঢাকা শহরের পটভূমিকায় এক বলিষ্ঠ প্রতিবাদী লেখা 'আদাব'-এর মাধ্যমে। আর 'কালকূট' নামে লেখকের রাজনৈতিক লেখাটি ঐ একটি লেখার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। লেখক কালকূট আর কখনও রাজনৈতিক লেখা লেখেননি। ১৯৫৪ সালে 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে'র মাধ্যমে কালকূট তাঁর নিরাসক্ত বাউল-মনকে পাঠকের সামনে হাজির করলেন অন্য আঙ্গিকে। সম্পূর্ণ নতুন রচনাশৈলী নিয়ে কালকূটের আবির্ভাব হয়েছিল যা বাঙালী পাঠককুলকে প্রাণের আবেগে উদ্বেলিত করে তুলেছিল। সমরেশ বসুর লেখনীশৈলী থেকে আলাদা কালকূটের লেখনীশৈলী। একই মানুষের দ্বৈত সত্তা — 'সমরেশ' ও 'কালকূট'। একদিকে সমাজ সচেতন-লড়াকু-সংগ্রামী-প্রতিবাদী-বাস্তববাদী লেখকসত্তা আর একদিকে বাউলমনের নির্বিকার সত্তা, যে মানব-মন অন্বেষণে পথে পথে বেরিয়ে পড়ে। এখন এই 'সমরেশ বসু' ও 'কালকূট' এই দুই ভিন্ন সত্তা কীভাবে কাজ করে গেছে এটাই আলোচনা করা হবে নানান ঘটনাবলীর মাধ্যমে।

১৯৪৬ থেকে ১৯৮৮-র মার্চ পর্যন্ত প্রায় চার দশক ধরে সমরেশ বসু ও কালকূট প্রয়াগের গঙ্গাযমুনার স্রোতধারার মতো কলমের দুই ধারায় জাল বুনে বিচিত্র পটভূমি, বিচিত্রভাবনা, জীবনের ভাঙাগড়া, সুখদুঃখের খুঁটিনাটি চিত্র ও মানবমনের আন্তরভূমিকে নিপুণ চিত্রকরের মতো চিত্রায়িত করে বাংলাসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। নিকট দূরত্বে বাইরে দেখে বা চোখের দেখাকে কল্পনার জাল বুনে লেখাকে প্রাণবন্ত করে তোলেন নি। ব্যক্তিজীবনের নিজস্ব অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি, অন্তরঙ্গ অনুসন্ধানই ভিন্ন ভিন্ন রূপে ভিন্ন ভিন্ন পটপরিবেশের মধ্য দিয়ে তাঁর সাহিত্যে উপস্থিত করেছেন। যে কোন পরিবেশে যে কোন মানুষের সঙ্গে তিনি অন্তরঙ্গভাবে মিশে যেতে পারতেন। ভদ্রতার আবরণ, অহঙ্কারের আভরণ আর আভিজাত্যের কৌলিন্যকে দূরে সরিয়ে রেখে তিনি হয়ে যেতেন তাদের আপনজন, একেবারে অতি কাছের মানুষ।

তিনি ছিলেন আশ্চর্য গল্প বলিয়ে কথকঠাকুর। এই গুণ তিনি পেয়েছিলেন তাঁর মা ও বাবার কাছ থেকে। মা শৈবলিনী দেবী ও পিতা মোহিনী মোহন বোসের অষ্টম সন্তান ছিলেন সুরথনাথ। সমরেশ বসুর বাল্যকালে নাম ছিল সুরথনাথ। অদ্ভুত এক ক্ষ্যাপামি বারে বারে সুরথনাথকে ঘরছাড়া করেছে। তাঁর মা বলতেন অষ্টম গর্ভের ছেলে একটু অন্যরকম হয়। তার মা

ছিলেন আশ্চর্য কথকী। পৌষের নিশাকালে বাতি নিভিয়ে তিনি ব্রতকাহিনী বলতেন। রোমাঞ্চকর ব্রতকাহিনী রাতের আঁধারে কালকূটকে এক অজানা কল্পলোকে নিয়ে যেত। সেইসব কাহিনী বন্ধুদের বলতে গিয়ে নিজের কল্পনাকে মিশিয়ে দিয়ে ব্রতকাহিনীকে উপভোগ্য করে তুলতেন। শৈশবেই মনের অবচেতনে উত্তরকালের কথাশিল্পীর বীজ বোনা হয়ে গিয়েছিল। মা-ই ছিলেন ভাবীকালের কথাচিত্রশিল্পীর প্রথম প্রেরণাদাত্রী। আর পিতা? তিনি ছিলেন সংসার উদাসীন। জমিদারি এস্টেটে চাকরি করতেন কিন্তু চাকরির গুরুত্ব তাঁর কাছে ছিল না। গুরুত্ব ছিল রামায়ণের পাঠকতা আর পাঁচালীর গায়কীতে। কথা-কাহিনীকে তিনি নাটুকে ভঙ্গিতে পরিবেশন করতেন মহিলা-পুরুষের জমজমাট আসরে। রসিক গায়ক ছিলেন তিনি। ব্যবসা করতে গিয়ে বারে বারে ব্যর্থ হয়েছেন। শহরে বা গ্রামে কোথাও কোন পেশাতেই তিনি সাফল্য লাভ করেন নি। সংসারে কোনো সমস্যা দেখা দিলেই তাঁর সংসার বৈরাগ্য আসত। তিনি বেরিয়ে পড়তেন তীর্থদর্শনে। সেইজন্য তাঁর সংসারে তেমন সচ্ছলতা কখনও আসেনি। কিন্তু অর্থের চিন্তাও তেমন ছিল না। জ্যেষ্ঠপুত্র মাতুলালয়ে মানুষ হয়েছিল। মাতুলালয়ের মাধ্যমেই মাত্র ঊনিশ বছর বয়সে জ্যেষ্ঠপুত্র রেলের চাকরিতে ঢুকেছিল। অর্থকরী দায়িত্ব পুত্রের ওপরেই পড়েছিল। তাঁর পিতার সংসার উদাসীনতা, সংসার বৈরাগ্য, রসিক গায়কী সবকিছুই প্রভাব ফেলেছিল বালক সুরথনাথকে যা সমরেশ বসুকে কালকূট হয়ে উঠতে সাহায্য করেছে।

শুধু তাঁর পিতা কেন? ছোট কাকাও ছিলেন বাউন্ডুলে চিত্রশিল্পী। শিল্পচর্চা একটু জমে উঠলেই তাঁর ডানায় কাঁপন লাগত। মাঝে মাঝে তিনিও উধাও। কোথায় শিল্পচর্চা? রং, তুলি, ইজেল সব ধূলায় গড়াগড়ি। আর সুরথনাথের মনে রং তুলিই নেশা ধরিয়ে দিত। রং তুলি নিয়ে আঁকতে বসে মেতে যেতেন কল্পনাকে ইচ্ছে মতন রাঙিয়ে দিতে। কখনও কখনও ছোটকাকাও তাঁকে রং-তুলির খেলায় মাতিয়ে দিতেন। পৌষ মাসের সংক্রান্তির দিন যখন সবাই ঘুড়ি লাটাইয়ে মন দিত তখন সুরথনাথের মন লেগে থাকত রং-তুলি-ইজেলে। তাঁর দিদি ও মেজদা আঁকাকে তেমন গুরুত্ব দিতেন না। ওঁদের গুরুত্ব ছিল পাঠ্য বিষয়ে। কিন্তু সেখানে সুরথনাথ আপনভোলা। পড়ার বিষয়ে মন নেই কিন্তু রচনা লিখতে দিলে? নিজের কল্পনা সেখানে ডানা মেলবে যে, তাই রচনা লিখতে উৎসাহী। সুরথনাথের রক্তের মধ্যেই ছিল ঘরবিবাগী স্বভাব তাই কাকার শিল্পচেতনা 'সমরেশ বসু'র ভাবীকালকে সমৃদ্ধ করেছিল। তিনি তাঁর কলমকেই তুলি করে ভিন্ন ভিন্ন পটপরিবেশে মানবজীবনকে চিত্রায়িত করেছেন। লালবাগের কেল্লা, বুড়িগঙ্গার চোরা টান, নৌকার বেদেনীদের সঙ্গ সবই তাঁকে বারে বারে ঘরছাড়া করেছে। হাতে তামার দু'পয়সা পেতেই ডিঙি নৌকা ভাসিয়ে দিয়েছিল একাই বুড়িগঙ্গায় যাবে বলে। বড় নৌকার মাঝিরা তাঁকে উদ্ধার করে এনেছিল নিশ্চিত বিপদের মুখে পড়ার আগে। ছোট নাও বুড়িগঙ্গায় পড়ার আগেই উদ্ধার

পেয়েছিল। লালবাগের কেল্লা, ঢাকার বুড়িগঙ্গার চোরা স্রোত, পাখ-পাখালি, গাছপালা প্রাকৃতিক পরিবেশ সবকিছু সুরথনাথের মনে বৈরাগ্যের ছায়া ফেলেছিল। তাঁর ভাবুক মন অদ্ভুত একটা ঘোরের মধ্যে থাকত। তাই সে একদিন বুড়িগঙ্গার তীরে উদাস চোখে নদীর স্রোত, বিভিন্ন ধরনের নৌকা, লোকজন দেখতে দেখতে আবার অজানা পথে পা বাড়িয়েছিল। বাবু একটা পয়সা দ্যান, এই ধ্বনিতে মোহগ্রস্ত হয়ে পশ্চিম সর্দার ঘাটের দিকে এগিয়ে গিয়ে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন — - 'বাবু একটা পয়সা দ্যান' বলে। পায়ে পায়ে অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছিলেন ঘোরের মধ্যে, তাই মতিমহল বায়োস্কোপের কাছে বাবার চেনা শিশির ডাক্তারবাবুর কম্পাউন্ডার পাকড়াশীকে চিনতে না পেরে তারই কাছে হাত পেতেছিলেন। এই ক্ষ্যাপামির উত্তর দশ বছরের বালক দিতে পারেনি সেদিন।

এই ক্ষ্যাপামিই তাঁকে স্কুলের প্রথাগত পাঠও শেষ করতে দেয়নি। পাঠশালায় গুরুর শিক্ষা তাঁর ভালো লাগত না তাই স্কুল পালিয়ে চলে যেতেন প্রকৃতির কাছে পাঠ নিতে। জায়গাটা এমন বেছেছিলেন ভাবলেই আশ্চর্য লাগে — মানুষের শেষগতি যেখানে, সেই শ্মশানে। কেউ তাঁকে দেখে ফেলবে না সেইরকম একটা নিরিবিলি স্থানে বসে চিন্তা-ভাবনার জাল বুনে যেতেন। বুড়িগঙ্গায় বয়ে যাওয়া স্রোতে নৌকার চলাচল দেখতে দেখতে প্রকৃতির রূপ-রস-গন্ধে ডুবে যেতেন। স্বভাব বৈরাগ্য শৈশবকাল থেকে সুরথনাথকে গ্রাস করেছিল। অজানার হাতছানিতে তাঁর কৌতূহলী মন শৈশবকাল থেকে বারে বারে বিপদের মুখে পড়েছে তবুও মন দমে থাকেনি। তাই আবার ওই শ্মশানের কাছেই একটি টিনের চালাঘরে শেয়ালের গর্ত দিয়ে ঢুকে পড়েছিলেন। ঘরে ঢুকেই ভয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিলেন, সামনে দুটো লাশ ছিল। তা দেখে ওই গর্ত দিয়ে আর বেরোতেই পারেন নি। ডাক্তার ছাত্ররা এসে যখন দরজা খুলেছিল তখন বহু বিড়ম্বনার মধ্য দিয়ে দৌড়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন। বই পড়ে রইল লাশকাটা ঘরে আর সুরথনাথ পড়ার টেবিলে 'অনধিকার প্রবেশ' নিয়ে লিখতে বসে কল্পনার ডানায় ভর করে উড়ে গিয়েছিলেন ভাবরাজ্যে। বাড়ীতে সবাই জানতে পারলে তার যে কঠিন শাস্তি হবে এ ভাবনাও সেই মুহূর্তে ভুলে গিয়েছিলেন। পরে অবশ্যই অসুস্থও হয়েছিলেন। এমনি ছিল তাঁর কৌতূহলী মন যা সমরেশ বসুকে ভাব বৈরাগ্যের বৈচিত্র্যে পৌঁছে দিয়েছে।

সুরথনাথের হাতছানিতে কালকূট নব নব রূপে তাঁর সৃষ্টিকে পাঠককুলের সামনে তুলে ধরেছেন। জীবনের কঠিন সময়ে মস্তিষ্ককে কীভাবে স্থির লেখনীর মাধ্যমে কল্পনার রাজ্যে পৌঁছে দেওয়া যায়, এই প্রেরণার বীজটি শৈশবকালে তাঁর ডাকাবুকো স্বভাবের মধ্যে নিহিত ছিল। বাবার উদাসী মনে বাউলের হাতছানি ছিল, তিনি মাকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন চন্দ্রনাথ পাহাড়ের উদ্দেশ্যে। সুরথনাথ মিথ্যা বলে তাড়াতাড়ি পাঠশালা থেকে এসে দেখেছিলেন ভো ভো।

সবাই চলে গেছে, তাঁকে সঙ্গে নেননি মা-বাবা। মনের দুঃখের কথা তাঁর বন্ধু বলু জানতে পেরেছিল। বড় একটা ইলাস্টিক দেওয়া ইজের পড়ত। কোটটা পিলেতে ফোলা ছিল, সেই ইজেরটা সবসময় একহাত ধরে রাখত। বলুর সঙ্গে মেশাটা তাদের বাড়িতে কেউ পছন্দ করতেন না তবু নিয়মের ঘেরাটোপে কেউ সুরথনাথকে বেঁধে রাখতে পারেনি। সুরথনাথ তাই স্কুল পালিয়ে বলুর সঙ্গে রমণার মাঠ পেরিয়ে ধানমন্ডীর পাহাড় দেখতে গিয়েছিলেন। ছোট্ট বলু সৈনিকের পুরনো চাঁদমারির ঢিপিকে পাহাড় বলে মনে করেছিল তাই ওকে নিয়ে গিয়েছিল। অনেকখানি রাস্তা পেরোতে দশ বছরের বালকের পা ফুলে গিয়েছিল, চোরকাঁটায় ভরে গিয়েছিল পোশাক; তবুও পাহাড় দেখেছিল। পাহাড়ের মাথা ছাড়িয়ে যাওয়া বড় বড় গাছের ছায়া, ঝোপঝাড়ের গলাগলি, তদুপরি পাহাড়ের ওপর অ্যাশশ্যাওড়ার আর কাঁটা গাছের ছড়াছড়িতে একটা ভৌতিক পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল। বলু ভয় পেয়ে সুরথনাথকে তার কোমরের লোহাটাকে স্পর্শ করে থাকতে বলেছিল। ভয় কাটিয়ে তবু সুরথনাথ পাহাড়ে উঠেছিল। বড় বড় গর্তে পাহাড়টা হাঁ করে ছিল, কিন্তু পাথর বা প্রস্রবণ দেখতে পায়নি। ভূগোলের সঙ্গে তেমন করে মিলিয়ে নিতে পারেনি। তবুও পাহাড়! পাহাড়ের মাথায় উঠে দিগন্ত ব্যাপী রমণার মাঠ, ঢাকা শহর, পাকা রাস্তা, তাঁকে এক মুগ্ধতায় ভরিয়ে দিয়েছিল। বলুর সঙ্গে মনে মনে এই বিশ্বাসে পৌঁছেছিল যে চন্দ্রনাথ পাহাড় হয়ত এমনটিই হবে। দেরীতে বাড়ীতে ফিরেছিলেন ছেঁড়া জামা, চোরকাঁটায় ভর্তি পোশাক নিয়ে দিদির কাছে ধরা পড়ে গিয়েছিলেন। বৌদি তাঁকে দিদির মারের হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন। কিন্তু পাহাড়ের কথা শুনে সুরথনাথের এক আত্মীয় সম্পর্কিত দাদা মনোতোষদা তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে হাসতে হাসতে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে ওটা পাহাড় নয়, সৈনিকদের পরিত্যক্ত চাঁদমারির ঢিপি। কিন্তু সুরথনাথের বিশ্বাস হয়নি, মনোতোষদা জানে না! অনেককাল পর্যন্ত সুরথনাথের মনে ধানমন্ডীর পাহাড় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল। সেই পাহাড়ের মোহময় হাতছানি সেই ছোটবেলা থেকেই অন্তরে জাগরুক ছিল যা পরবর্তীকালে কালকূটকে তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে এগিয়ে নিতে সাহায্য করেছে।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পথের পাঁচালী অপুই যেন সুরথনাথে এসে ভর করেছিল। সব শিশুই অপু, অপুর চোখের বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা; অজানাকে জানবার, অচেনাকে দেখবার আগ্রহ সব শিশুর মধ্যে বিরাজমান থাকে। অপু দিদি দুর্গার সঙ্গে রেলগাড়ি দেখতে গিয়েছিল। দৌড় দৌড় দৌড়। অপু দিদির সঙ্গে অনেকদূর তার কচি পায়ে দৌড়ে গিয়েছিল, তেমন করেই তো বলুর সঙ্গে সুরথনাথ ধানমন্ডীর মাঠ পেরিয়ে পাহাড় দেখতে গিয়েছিল। অপু আর সুরথনাথ মিলেমিশে একাকার। সমরেশ বসুকে এই সুরথনাথ যেমন সারাজীবন ছুটিয়ে নিয়ে গেছে তেমনি তাঁরই সৃষ্ট কালকূটকে অমৃতের তৃষ্ণায় বার বার ঘরছাড়া করে বিশ্বপথিক করেছে। নদী যেমন ছোট্ট

সুরথনাথকে টেনেছে তেমনি করে ওই ছোটবেলা থেকে নারীও ঠিক তাঁরই সমবয়সী মেয়েরাও তাঁকে টেনেছে। নারীর হাতছানিতেও তিনি বরাবরই মোহিত হয়ে যেতেন। একবার বেদেনীদের ডেরায় ভানুমতীর খেল ও ভেল্‌কীতে মুগ্ধ হয়ে দিদির বয়সী সারি বেদেনীর কালো চোখের ঝিলিকে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। ওই অল্পবয়সেই তার চিরদিনের পুরুষের প্রেমিক মনটি জেগে উঠেছিল সারিনিশির ডাকে সাড়া দিয়ে। শুধু সারি বেদেনীই নয়, মিশুক স্বভাবের জন্য অন্য বেদেনীদের সঙ্গেও অল্প সময়ের মধ্যে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। ঘরে ফেরার কথা তার মনে পড়েনি, তার যাযাবর মন বেদুইন হয়ে গিয়েছিল। বাড়ীর পেয়াদা এসে ওই ডেরা থেকে তাকে উদ্ধার না করা পর্যন্ত ওদের রঙ্গ সঙ্গেই গা ভাসিয়েছিলেন। বেদেদের কাছে থেকে এই যে অন্য এক ধরনের জীবনপ্রণালীকে উপভোগ করা, তাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ এই 'মিলমিশ' পরবর্তীকালে সমরেশ বসুকে কালকূটের লেখার রসদ জুগিয়েছিল। শুধু তাই নয়, বয়সে বড় মেয়েদের প্রতি এই আকর্ষণ পরবর্তী সুরথনাথের জীবনে বিরাট ঝড় তুলেছিল যা থেকে পরিণামে বাঙালী পাঠককুল পেয়েছিলেন একজন বলিষ্ঠ-লড়াকু-সমাজসচেতন প্রতিবাদী লেখক সমরেশ বসুকে। আবার এই সমরেশ বসুকে সুরথনাথ হাতছানি দিয়ে তাঁর ভাবরাজ্যে কালকূটকে সৃষ্টি করেছিলেন।

সমরেশ বসুর ব্যক্তিজীবনে যতই প্রবেশ করা যায় ততই দেখা যায় সর্বত্রই সেই সুরথনাথের নিশি। সুরথনাথের মিলমিশের ক্ষমতা এতই বেশি ছিল সমবয়সী মেয়েদের মধ্যে তাঁকে নিয়ে ঈর্ষার উদ্রেক হত। যেমন হয়েছিল দিদির ভাসুর-কন্যা হেলেন ও তার বন্ধু সোরির মধ্যে। তেমনটি হয়েছিল মেমী, কমলা, মণি ও পুষির মধ্যে। রাজু অর্থাৎ রাজলক্ষ্মী কেন আলির সঙ্গে ঘুড়ি ওড়াবে? রাজুর সঙ্গলাভেই তার হৃদয়ের প্রেমিক পুরুষটি জেগে উঠেছিল। ছেলেবেলার বন্ধু রাজলক্ষ্মীকে একদিন পুঁই মেটুলী দিয়ে সাজিয়ে দিয়ে দু'জনে হাত ধরাধরি করে রাজলক্ষ্মীর দিদির সামনে দিয়ে দোলাই খালের বাঁধে রামসীতার মন্দিরে চলে গিয়েছিলেন। পিছনের পরিণামের কথা বোধহয় একবারের জন্যও মনে পড়ে নি। ভাবরাজ্যের আপন খেয়ালে সেই বালক বয়সেই পত্নীনিষ্ঠ রামের মতো তাঁর মনে চির প্রেমিক পুরুষটি জেগে উঠেছিল। জ্যোৎস্না রাতে রামসীতা মন্দিরের ছায়াময় পরিবেশ, মায়াময় ভজনের সুরধ্বনি, রামসীতার ঘাট, কলুটোলার রাস্তা, প্রাকৃতিক পরিবেশ সবকিছু বালক সুরথনাথের হৃদয়ে চিরদিনের প্রেমিক পুরুষের জন্ম দিয়েছিল, যা উত্তরকালে সুরথনাথকে সমরেশ বসুতে পরিণত করেছিল। তাহলে যার সঙ্গে প্রাণের মিলমিশ সে কেন আলির সঙ্গে ঘুড়ি ওড়াতে যাবে এই অভিমানে রাজুর ডাকে সাড়া না দিয়ে নিশ্চিন্দার জঙ্গলে ঢুকে গিয়েছিলেন। জঙ্গলে ঢুকে নিস্তার ছিল না, সেখানে পিঁপড়েরা তাঁকে অভ্যর্থনা করেছিল। মাথাভর্তি পিঁপড়ে সহ পিঁপড়ের ডিম নিয়ে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে ঝাড়াঝাড়ি করার সময় মেমীদের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, তারা পরিচর্যার জন্য বাড়ীতে নিয়ে যায়। মেমীর সামান্য ত্রুটিতে

ওর দুই বন্ধু কমলা ও মণি চলে যায় আর একজন পুষি দূর থেকে ভ্রূ কুঁচকে মেমীর পরিচর্যা লক্ষ করতে থাকে। মেমীর কাজের মধ্যে একটা অহংভাব, নিজস্ববোধ জেগে উঠেছিল যা দেখে মনে হচ্ছিল যে সুরথনাথের ওপর অধিকার শুধু মেমীরই আছে। চার বন্ধুর মধ্যে আচমকা আসা সুরথনাথকে নিয়ে বিচ্ছেদ হয়ে যায়। রাজুকে শিক্ষা দিতে এসে চার কন্যার মধ্যে তাঁকে নিয়ে আলো-আঁধারি খেলা শুরু হয়েছিল সেটা সেই বালকবয়সেই সুরথনাথ বুঝতে পেরেছিলেন। এই অপরকে বোঝার, তাঁর হৃদয়স্থলে ঢোকার সূক্ষ্মদৃষ্টি তাঁর সেই বালকবয়সেই হয়েছিল। এই সূক্ষ্মবোধে সমরেশ বসু যখন কালকূট হয়ে লেখনী ধরেছেন তখন তিনি মানব-মন সন্ধানী হয়ে ঢুকে পড়েছেন হৃদয়ের অন্তঃস্থলে। এই বোধ, অনুভূতি তাঁর মধ্যে বাল্যকাল থেকে জাগরুক ছিল।

আবার জীবনবোধের তীব্র ঘৃণা, ধিক্কারের জন্মও হয়েছিল বালকবয়সেই। সেখানে তার চিন্তাশক্তি বাস্তববোধকে সজাগ করে তুলেছিল। মণিদি ও নরেনদা, দুটি ভাইবোনে এত প্রভেদ কী করে হয়, ভেবে কূল পেতেন না সুরথনাথ। অল্পবয়সের বিধবা মণিদি তাঁকে আকর্ষণ করত। তাঁর স্নেহের টানে কখনও কখনও সুরথনাথ তাঁর বাল্যসঙ্গিনী রাজুকে নিয়ে তাঁর কাছে যেতেন। মণিদির বিষণ্ণতা সুরথনাথের মনকে স্পর্শ করত। ওই বয়সেই তাঁর মনে হত মণিদির হাসিটা ঠিক হাসি নয়, ওর মধ্যে বেদনা লুকিয়ে আছে। একদিন সুরথনাথ দেখে ফেলেছিলেন মারমুখী মণিদির দাদাকে। যা বোঝবার সেদিনই ওই ভয়ংকর দৃশ্য দেখে সুরথনাথ বুঝে গিয়েছিলেন। মণিদি আত্মহত্যা করেছিল। সুরথনাথ মণিদির মৃত্যুর জন্য তাঁর দাদাকেই দায়ী করেছিল, সেই ক্রুদ্ধ চোখের চাউনি আর মণিদির ভীত আর্ত চোখের চাউনি সুরথনাথকে প্রতিবাদী, সমাজ-সচেতন লেখক সমরেশ বসু হতে সাহায্য করেছে। নরেনদার বাইরের আবরণটি ছিল বিনয়ী, ভদ্র আর ভিতরে ছিল হিংস্রতা, বর্বরতা যা সুরথ বাল্যবয়সে ভয়মিশ্রিত চোখে প্রত্যক্ষ করেছিল, যা তাঁর উচিত-অনুচিত বোধকে জাগরিত করেছিল চির উদাসী সুরথনাথের মনে। তীব্র ঘৃণার জন্ম হয়েছিল ঐ মুখোশধারীর নৃশংস আচরণে। আরো তীব্র ঘৃণার জন্ম হয়েছিল আর একজনের ওপরে। সে হল ভুঁইমালীদের যুবক ছেলেটির ওপরে। সে রমণার মাঠে ঘোড়দৌড়ের জন্য জঘন্য কাজে লিপ্ত হয়েছিল। পান্না গোয়ালার ছোট্ট মেয়েটাকে ওই ভুঁইমালী যুবক ছেলেটি হত্যা করেছিল তার কানের সোনার দুল খুলে নেওয়ার জন্য। ছটফটে, দোলাই খালের দুরন্ত সাঁতারু ছিল সে। পান্না গোয়ালার বুক চাপড়ে তীব্র ক্রন্দন ধ্বনি তার মনকে ব্যথাতুর করে তুলেছিল। আর তীব্র ঘৃণার জন্ম হয়েছিল ওই নৃশংস যুবকটির ওপর। তাঁর ছোটবেলার চেনা বৃত্তের মধ্যে অচেনা হিংস্রতার জন্ম দেখেছিলেন। ভুলতে পারেন নি, বাল্যকালের সেই দেখা ঘটনাটি; সমরেশ বসু চিত্রিত করেছেন তার হ্রেষাধ্বনিতে। এমনই অনেক দেখা, নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার বীজ রোপিত হয়েছিল তাঁর মনে যা তাঁর উত্তরকালকে পত্রে পত্রে পল্লবিত করেছিল। সুরথনাথের জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনা, চোখে দেখা

ঘটনা নানা পরিবর্তিত পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হতে হতে একটি নতুন সত্তার চরভূমি জেগে উঠেছিল। সেই চরভূমির প্রাথমিক লেখকসত্তাই হল সমরেশ বসু।

ছোটকাকার বিয়ের বিভিন্ন ক্রিয়া অনুষ্ঠান সুরথনাথের মনে বিশেষ ছাপ ফেলেছিল। তিনি ঘোরের মধ্যে সেই অনুষ্ঠান লক্ষ করেছিলেন আর ছোটকাকিমা সৌন্দর্যে মুগ্ধ বালক কিছুতেই তাঁর কাছ ছাড়া পাচ্ছিলেন না। বাল্যকালে দেখা সেই বিয়ের দৃশ্য কয়েকটি বালকের চোখ দিয়ে তুলে ধরেছেন লেখক সমরেশ বসু। ছোট ছোট দৃশ্য, ঘটনা, পরিবেশ সবই বালক সুরথনাথের ভাবীকালকে পরিপুষ্ট করেছিল। পড়াশুনায় তাঁর মন বসত না। অঙ্ক কষতে ইচ্ছা করতই। বাংলা ও ইতিহাস তার ভালই লাগত আর রচনা লেখায় তাঁর জুড়ি মেলা ভার, নিজের বক্তব্যের স্বাধীনতায় ভাষা ডানা মেলত। কিন্তু পাঠ্যবিষয়ে তাঁর মন লাগত না। বাবার শাসন, গৃহশিক্ষকের ধমকানি, মেজদার বিদ্রূপ, দিদির শাসানি— কোনকিছুই সুরথনাথকে পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে টেনে আনতে পারেনি। ইস্কুল তাঁর কাছে জেলখানার মতো। নিয়মের শাসন তাঁকে কোন কিছুতে বেঁধে রাখতে পারে নি। পাঠশালা ছেড়ে হাইস্কুলে গেলে কি হবে, পড়াশুনায় তেমন অগ্রগতি হয়নি। রাজনগর উচ্চ বিদ্যালয়ের নিয়মনীতি তাঁর ভালো লাগেনি। তাঁর জামাইবাবু ওই বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন কিন্তু নিয়মের শাসনে সুরথ বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। উদাস প্রকৃতি তাঁকে হাতছানি দেয়। স্কুল পালিয়ে প্রকৃতির কাছে শিক্ষালাভ করে। এছাড়া এক ধরনের অসামাজিক সামাজিকতায় সুরথনাথ স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। নিষিদ্ধ জিনিসের প্রতি আগ্রহীশীল হয়ে পড়েন। বন্ধু চিত্তর কাছ থেকে লুকিয়ে গল্পগুচ্ছ প্রথম খণ্ড, দুর্গেশনন্দিনী, মা পড়েছিলেন। বই পড়ে বিশেষ ক্ষেত্রে তাঁর প্রতিক্রিয়া ঘটেছিল অনিবার্যভাবে। দিদি ও মাস্টারমশাই-এর আচরণ তাঁর চোখে বিশেষভাবে ধরা পড়েছিল। সুরথনাথের এই ধারণাকে স্পষ্ট করেছিল তাঁর সঙ্গিনী রাজলক্ষ্মী। তাঁর অজানা ভিতর দুয়ারের কপাট খুলে দিয়েছিল রাজির চোখের কালো দ্যুতি। উন্মোচিত হয়েছিল দশমীর চোখের অপার রহস্য একাদশী অনুসন্ধিৎসু চোখে। যেখানে নিষেধ সেখানেই তার কৌতূহল বেশি। সময়টা ভুললে চলবে না — কৈশোর। দশ বছরের ছেলের ক্ষ্যাপামি তার কৈশোর কালকেও ক্ষেপিয়ে নিয়ে চলেছে। অবশেষে এই স্কুল পালানো, ঘর জ্বালানো ছেলেকে পাঠিয়ে দেওয়া হল নৈহাটীতে, বড়দা মন্মথনাথের কাছে। বুড়িগঙ্গা থেকে একেবারে গঙ্গায়। স্বভাব বৈচিত্র্যে ক্ষ্যাপা বালকের আরও সুবিধা হয়ে গেল। প্রায় অভিভাবকহীন অবস্থায় পড়াশুনা শিকেয় উঠেছিল। দাদা কর্মস্থলে, আর ছোট গানবাজনা করে গল্প উপন্যাস পড়ে একবছর কাটিয়ে নবম শ্রেণীতে আর ওঠা হল না। নৈহাটী রেল কোয়ার্টারের বাস উঠিয়ে আবার ফিরে আসতে হল ঢাকায়। ঢাকেশ্বরী কটন মিলে অ্যাপ্রেন্টিস হিসাবে কাজ শিখতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু ওই ক্ষ্যাপামি তাঁকে কারখানা পালিয়ে নাটক অভিনয়ে মাতিয়ে রেখেছিল। এই নাটকীয়তা উত্তরকালে তাঁর জীবনে দ্বিমুখী ভূমিকা

নিয়েছিল।

এই কিশোর বয়সেই সুরথনাথ সুন্দরের খোঁজ পেয়েছিলেন এক ভয়ংকর কুৎসিতের মাঝে। ইংলিশ মিডিয়ামে পড়া ঝকঝকে চেহারার ছেলে সেন্টুর কুষ্ঠ হয়েছিল। সকলে তাকে পরিত্যাগ করেছিল, এমনকি তার বাড়ির লোকও তাঁকে নিচের একটা ঘরে অনাদরে ফেলে রেখেছিল। সেই কৈশোরকালে সুরথনাথ সকলকে লুকিয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে যেত। অনেক গল্প করত তার সঙ্গে। এই ঘটনা তাঁর মনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। কুষ্ঠ রোগীকে অত্যন্ত কাছ থেকে দেখেছিলেন ও তাঁর ব্যথাবেদনার অংশীদারও হয়েছিলেন। মনের অবচেতনে 'শাম্ব' রচনার বীজ বপন হয়েছিল সেই কৈশোরকালে। সেই বীজ অঙ্কুরিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছিল সমুদ্রের নির্জন সৈকতে ভ্রমণে গিয়ে। কোণারকের মন্দির দেখে কালকূট অভিভূত, রোমাঞ্চিত। মৈত্রেয় বনের শন্‌শন্‌ বাতাসের সঙ্গে পঞ্চনদীর দেশ শাম্বাদিত্যপুরের বাতাসের স্পর্শ পেয়েছিলেন। যেখানে কৃষ্ণপুত্র শাম্ব মানব কল্যাণার্থে বারো বছর ধরে কর্মসাধনার মধ্য দিয়ে কুষ্ঠ রোগ নির্মূলের চেষ্টা করেছিলেন। নিজেও রোগমুক্ত হয়েছিলেন; আর সঙ্গে কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত একদল হতমান, আশাহত মৃত্যুপথযাত্রী মানুষেরও রোগমুক্তির ব্যবস্থা করেছিলেন। কুষ্ঠ কোন অভিশাপ নয় — রোগ; সেই রোগ সারানোর জন্য সুচিকিৎসার ব্যবস্থাও করেছিলেন। কর্মের মাধ্যমে শাম্ব ঢিবি আরোহণ করেছিলেন। এই কাহিনী কালকূটকে 'শাম্ব' কাহিনী রচনাতে ব্রতী করেছিল। সুরথনাথের সেন্টুকেই সমরেশ বসু কালকূটের মাধ্যমে শাম্বকে পুরাণ থেকে বের করে এনে এই পার্থিব জগতের মানব রূপে নতুনভাবে চিত্রায়িত করেছিলেন। এছাড়া বিশ্বমানবের কাছে একটা বার্তাও ছিল কুষ্ঠ রোগ অভিশাপ নয়, যথাযথ চিকিৎসার দ্বারা কুষ্ঠ রোগ নির্মূল করার শপথের বার্তা পাঠককুলের মাধ্যমে পৌঁছে দেওয়া। শাম্ব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। শৈশবকাল থেকেই ভয়ডরহীন দুঃসাহস, ঘৃণাহীন আসক্তি এসবই কিশোর সুরথনাথকে সাহায্য করেছিল।

বাড়ীতে দৈনিক পত্রিকা আসত ঢাকা ও কলকাতা থেকে। সেইসব পত্রিকা পাঠ করে বিস্তর আলোচনা চলত। আলোচনা প্রধান হয়ে উঠে আসত রাজনৈতিক দলাদলি ও পাশ্চাত্য জঙ্গীবাদ। সেইজন্য কংগ্রেস, গান্ধী, সুভাষচন্দ্র, জহরলাল, টেরিরিষ্ট বিপ্লবীদের কথা, মুসলিম লীগ, ফজলুল হক, জিন্নাসাহেব এই নামগুলোর সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। পরিচিত ছিলেন বিভিন্ন বক্তৃতার সঙ্গে। তাঁদের বাড়ীতে গান্ধীবিরোধী আলোচনা চলত। গান্ধীজীর কীর্তিকাহিনী শুনে শুনে গান্ধীজী সম্পর্কে একটা কৌতূহল ওই ছোটবেলাতেই জন্মেছিল। গান্ধীজীর বসবার অদ্বিতীয় ভঙ্গিটি সুরথনাথকে আকৃষ্ট করেছিল। গান্ধীজীকে দেখবার জন্য তাঁর মনে ইচ্ছা জেগেছিল। বাড়ীর পরিবেশে ইংরেজ বিরোধী হাওয়া ছিল তাই 'টিকটিকি' কথাটার সঙ্গে সুরথনাথ ছোটবেলা থেকেই পরিচিত ছিলেন। বিপ্লবীদের সঙ্গেও পরিচয় ঘটেছিল। তাঁদের বাড়ীতে হরপ্রসন্ন গুহ ও বগলাপ্রসন্ন গুহ ভাড়া

থাকতেন। বগলাপ্রসন্নকে দীর্ঘদিন কারাবাসের পর বাড়ীতেই অন্তরীণ করে রাখা হয়েছিল; তাঁকে শুধু একবারই দেখেছিলেন সুরথনাথ। তারপরে হঠাৎই একদিন উধাও হয়ে গিয়েছিলেন। হরপ্রসন্নকে মাঝে মাঝে দেখেছেন। দুই ভাই-ই সশস্ত্র বিপ্লবী। এঁদের খোঁজে প্রায়ই পুলিশের আগমন ঘটত। পুলিশের তল্লাশি কী ভয়ংকর হতে পারে সেই অভিজ্ঞতা সুরথনাথ নিজের চোখেই দেখেছেন। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার ছিল, কোনো ছোটছেলের কাছ থেকে পুলিশ একটি কথাও বের করতে পারেনি কখনও। হরপ্রসন্নের স্ত্রী সুরবালা স্বামী-সঙ্গ লাভে বঞ্চিত ছিলেন। তাঁর বাপের বাড়ি থেকে তাঁর দুঃখকে ভুলিয়ে রাখার জন্য নানারকম জিনিস দিয়ে ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা করা হত। কলের গান তাঁর ছিল। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প ও শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের স্বাদ প্রথম তাঁর কাছ থেকেই সুরথনাথ পেয়েছিলেন। এই সুরবালা মাসির বুকেই মুখ লুকিয়ে একদিন সুরথনাথ কেঁদে ভাসিয়েছিলেন। তাঁর ছোটকাকা কাকিমার চলে যাওয়াটা সুরথনাথ সহ তাঁদের বাড়ির কেউই মেনে নিতে পারেন নি। তরুণ কাকিমার বিরহ বেদনায় কেঁদেছিলেন সুরথনাথ, আর সুরবালা মাসিও কেঁদেছিলেন তাঁর কারাবাসী বিপ্লবী স্বামীর বিরহে। দুই ধারায় বয়েছিল অশ্রুধারা। সুরথনাথের বালককালের নরম মনে বিপ্লবীচেতনা, শেকড় গেঁড়েছিল। বিপ্লবী পরিমণ্ডল ছোটদের সতর্ক হতে শিখিয়েছিল পুলিশের সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্য। এসবই সুরথনাথকে সমরেশ বসু হয়ে উঠতে সাহায্য করেছিল।

সুরথনাথের আবেগতাড়িত মনে মেয়েদের প্রভাব পড়েছিল। পরবর্তীকালে সমরেশ বসুর জীবনে বিরাট প্রভাব ফেলেছিল। নারী সান্নিধ্য থেকে যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা তিনি লাভ করেছিলেন সেগুলো তাঁর শিল্পীসত্তাকে বিকশিত হতে সহায়তা করেছিল। রাজু-সুরথনাথ হল চিরকালের নর-নারী। রাজু প্রেমিকসত্তাটিতে শৈশবকালেই জাগরিত করে তুলেছিল। দিদির বন্ধু ময়নাদি ও তার বোন মেমীর পরিচর্যা, ছোট কাকিমার চুম্বন, কাকার আঁকা নগ্ন নারীমূর্তির স্কেচ, কেষ্ট ঠাকুরের ছবি আঁকায় পারদর্শী তরুণী বউয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা, সুরবালার সান্নিধ্যে গল্প-উপন্যাস পাঠ ও গীতচর্চা, বেদেনী কন্যার চোখের কটাক্ষ — সব সুরথনাথকে সমরেশ বসু হয়ে উঠতে সাহায্য করেছে। ভবিষ্যতে সমরেশ বসু হয়ে ওঠার বীজ শৈশবেই তাঁর আন্তরভূমিতে পোঁতা হয়েছিল। সমকালে তাঁর লেখনীর সঞ্জীবনী ধারায় সেই বীজ অঙ্কুরিত হয়ে পত্রে পুষ্পে শোভিত হয়েছিল। কথাশিল্পী সাহিত্যিক হিসাবে খ্যাতির শিখরে পৌঁছেছিলেন। এই বাল্যকাল থেকে কৈশোরকালের থেকেই তিনি জীবনের রস সংগ্রহ করেননি। আরও কঠিন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তাঁকে এগিয়ে যেতে হয়েছে। পনের বছর আবার তাঁকে যেতে হয়েছিল নৈহাটীতে, বড়দার কাছে। সংসারের নিয়মের মধ্যে কিছুতেই সুরথনাথকে বেঁধে রাখা যাচ্ছিল না। তাই তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল নৈহাটীতে। ছোটকাকা হেমেন গাঙ্গুলির বোহেমিয়ান জীবনযাত্রা উদাসী বাউল সুরথনাথকে আকৃষ্ট

করেছিল। নিজে আঁকতে পারতেন, আবার কাকাও তাঁর ভুলত্রুটি সংশোধন করে দিতেন। এবারে নৈহাটী এসেছিলেন কাকার মতো চিত্রকর হবেন এই আশা নিয়ে। আর্ট স্কুলে ভর্তি হবেন বলে এসেছিলেন। তাঁর মা তাঁর মেজদা ও দিদির মত আঁকাকে গুরুত্বহীন বলে মনে করলেও মা অতটা করতেন না। তবে মা অপছন্দ করতেন, সেই আমলে চিত্রশিল্পীর অত গুরুত্ব ছিল না। তবু সুরথ চিত্রশিল্পী হবেন এই আশার ডানাতেই ভর করে এসেছিলেন নৈহাটীতে। কিন্তু রঙ্গমঞ্চের হাতছানি তাঁকে বিদ্যালয়মুখী হতে দেয়নি। শ্রীরঙ্গমে গানের তালিম নিতে শুরু করেছিলেন কিন্তু বিধি বাম।

ভাগ্যের চাকা অন্যদিকে ঘুরতে শুরু করেছিল। কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর মুখোমুখী হয়েছিলেন। সেখানে বন্ধু দেবশঙ্করের দিদি গৌরীদেবী তাঁকে শুশ্রূষা করে সারিয়ে তুলেছিলেন। আগেই বলা হয়েছে, বিভিন্ন নারী তাঁর জীবনে বার বার এসেছে। এবার এলেন গৌরীদেবী সেবার প্রতিমূর্তি হয়ে। সুরথনাথ সুস্থ হয়ে ওঠার সময় গৌরীদেবীর প্রেমে পড়ে যান। কিশোর বয়সে প্রেম এতটাই গভীর ছিল যে সেই প্রেমের উন্মাদনায় মাত্র সতের বছর বয়সে চার বছরের বড় বাল্যবিবাহিতা, স্বামী পরিত্যক্তা গৌরীদেবীকে বিবাহ করে ফেললেন। যেখানে নিষেধ সেখানেই তাঁর মন ঘুরে ফিরে; কোন নিষেধের ভ্রূকুটি তিনি শৈশবকাল থেকে মানেন নি। এবার ওই ডাকাবুকো স্বভাবের কিশোরটি নিজের জীবনের সবচেয়ে বড় ঝুঁকিটা নিয়ে ফেললেন। যৌবনের উন্মেষকালে সমাজনীতি লঙঘনের ফলে রাতারাতি তাঁর জীবনটা বদলে গিয়েছিল। বাড়ীর কেউ এই দুঃসাহসিক কাজে সায় দিতে পারেন নি। অতএব রেল কোয়ার্টারের নিশ্চিন্ত বাসের জায়গা পরিবর্তন হয়ে গেল। পায়ের তলায় মাটি সরে গিয়েছিল। গৌরীদেবীকে বিয়ে করায় তাঁকে উঠে আসতে হয়েছিল বস্তিতে। নিম্নস্তরের মানুষের সঙ্গে তাঁর আনাগোনা ছিল, তাই ভাগ্যের ফেরে সেই বস্তিজীবনেই তাঁকে প্রেমের নীড় বাঁধতে হয়েছিল। শুধু বেঁচে থাকার জন্য কঠিন জীবনসংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিলেন ওই সতের বছর বয়সেই। বস্তি জীবনে হয়ত উপার্জনের, ঘর বাঁধার সঠিক সময় ছিল; কিন্তু সুরথনাথ যে পরিবার থেকে, যে পরিবেশ থেকে এসেছিলেন সেখানে কোনোটাই স্বাভাবিক ছিল না। গঙ্গার তীরে এসেছিলেন চিত্রশিল্পী হতে কিন্তু ভাগ্যের চক্রে তিনি হয়ে গেলেন সংসারশিল্পী। নৈহাটী থেকে চলে যেতেন গরিফায়। সেখানে জোয়ারদারের পোলট্রি থেকে ডিম সংগ্রহ করে ব্যারাকপুরের কোয়ার্টারে ডিমের যোগান দিতে যেতে হত। এই নতুন জীবনের সংগ্রামের মধ্য দিয়েই একটা অচেনা জগতের দুয়ার খুলে যায় তাঁর সামনে। সত্য মাস্টারের পরিচয় হয় এই জীবনসংগ্রাম সূত্রেই। এরপরেই বস্তিজীবনের অন্ত হয়, উঠে আসেন আঁতপুরের তরফদার পাড়ায়। রাজনীতির মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে 'জনযুদ্ধে'র তালিম নিতে শুরু করে দিয়েছিলেন। রাজনীতির পাঠ যখন নিয়েছেন তাতে সক্রিয় অংশীদারীত্ব তো থাকবেই। পার্টির ছুট্‌কো কাজ 'পোস্টার লেখা'য় অংশীদার হয়ে গেলেন। আঘাটা থেকে ঘাটে ওঠার এটাই ছিল প্রথম সোপান।

তাঁর ছন্নছাড়া জীবন অন্যদিকে মোড় নিতে শুরু করেছিল।

১৯৪২ খৃষ্টাব্দ 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে দেশ উত্তাল। সেই সময়ে ডিসেম্বর মাসে ইছাপুর রাইফেলস ফ্যাক্টরির স্মল আর্মসের ড্রয়িং বিভাগে ট্রেসারের চাকরিতে ঢুকে গেলেন, দৈনিক পাঁচ সিকে তাঁর বেতন। আঁকতে তিনি ভালোই পারতেন তাই চাকরিটা জুটে গিয়েছিল ওই ড্রয়িং বিভাগে। তাঁর নৈহাটী দ্বিতীয়বার আসার এক চিলতে ইচ্ছাপূরণ! কিন্তু তাঁর বিবাগী মন এতে থেমে থাকতে পারল না, খুঁজতে লাগলেন সংসারের যাঁতাকল থেকে মুক্তির উপায়। দেশ খুঁজছে বৈদেশিক শাসনের বাহুপার্শ্ব থেকে মুক্তির উপায়; সুরথনাথের বাউলমন খুঁজছে সংসারের যাঁতাকলের নিষ্পেষণের হাত থেকে মুক্তির উপায়। প্রাণের তাগিদেই স্থাপিত হয় 'উদয়ন ক্লাব' এবং যুক্ত হয়ে গেলেন হাতে লেখা 'উদয়ন পত্রিকা'র সঙ্গে। শুরু হল উদয়ন ক্লাবে রাজনীতি ভিত্তিক সংস্কৃতি চর্চা আর বুদ্ধিজীবী আড্ডা। চিন্তাশীল বুদ্ধিজীবীদের প্রবন্ধ নিবন্ধ সহ প্রগতিশীল বক্তব্য 'উদয়ন পত্রিকা'য় প্রকাশ পেতে থাকল। পাণ্ডুলিপির লিপিকর ও চিত্রকর ছিলেন স্বয়ং সুরথনাথ। অতএব প্রতিটি লেখার অক্ষর তাঁকে পড়তে হত ও বুঝতে হত। এর ফলে পাঠ্যবই পড়তে ভালো না লাগা সুরথনাথ নিজের অজান্তেই পড়ায় মন দিলেন। মন রে কৃষি কাজ জান না! সেই কৃষিকাজই সুরথনাথকে করতে হল, শুরু হয়ে গেল নিজেকে শিক্ষিত করে তোলা। হাতে লেখা পত্রিকা ভরাট করতে গিয়ে নিজেকেও কলম ধরতে হয়েছে। এটাই সুরথনাথের হাতে খড়ির প্রথম ধাপ। 'উদয়ন ক্লাবে' পাঠচর্চার সঙ্গে সঙ্গে তার কলমের কালির উত্তরণ ঘটেছে ভাবীকালে। বাল্য ও প্রথম কৈশোরের অস্থিরতার সমস্ত কিছুই ছিল একজন ভবিষ্যৎ কথাচিত্রশিল্পীর মানস গঠনের উপযুক্ত ভিত্তিভূমি। যা সাধারণের চোখে স্বাভাবিক বলে মনে হয়নি। সুরথনাথের মনের ভিতরে ছিল এক জাত চিত্রশিল্পী হওয়ার তুলি, আর হাতে উঠে এসেছিল কথাকারের কলম-রূপ তুলি। দুইয়ের সংমিশ্রণে সুরথনাথ হয়েছিলেন সমরেশ বসু। আর সমরেশ বসু বাল্যকালের ছন্নছাড়া স্বভাব বৈরাগী সুরথনাথকে ফিরিয়ে এনে সৃষ্টি করেছিলেন 'কালকূট'কে। একজনেরই দ্বৈত সত্তা। এই অধ্যায়ে শুধু আলোচিত হবে সমরেশ বসুর ব্যক্তিসত্তাকে নিয়ে আর পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে কালকূট সত্তা নিয়ে।

যাই হোক্, এই 'উদয়ন' পর্বে সুরথনাথের জীবন জীবিকা ও শিল্পের মধ্যে টানাপোড়েন চলছিল। ছাত্রজীবনের অকালমৃত্যু ঘটিয়ে সমাজের ভ্রূকুটিকে অগ্রাহ্য করে যে সংসার পেতেছিলেন সেই সংসারের চারটি প্রাণীর মুখে অন্ন তুলে দেওয়ার জন্য কঠিন জীবন সংগ্রাম করতে হয়েছিল। ভোররাতে অন্ধকার থাকতে উঠে স্নান সেরে ট্রেনে করে ইছাপুর যেতেন। প্রায় চোদ্দ ঘণ্টা পরে বাড়ী ফিরে ক্লান্ত শরীরে ছোট্ট একটা জলচৌকি নিয়ে হ্যারিকেনের আলোতে এক সৃষ্টির উন্মাদনায় লিখতে বসে মেতে যেতেন। ভুলে যেতেন সারাদিনের পরিশ্রমের ক্লান্তি, লেখার উন্মাদনায় তখন

তিনি অন্য ভাবজগতের মানুষ। স্ত্রী গৌরীদেবী সবসময় তাঁকে লিখতে উৎসাহ দিয়ে গেছেন। বন্ধুদের ভালোবাসা থেকেও বঞ্চিত হননি তবুও প্রতিবেশীর উপহাস, জীবনের মূল্যবান সময় পরিবারের মুখে অন্ন তোলার জন্য তাঁকে বেচে দিতে হয়েছে। এই যন্ত্রণাবোধ স্বভাব অস্থির সুরথনাথকে স্থির থাকতে দেয়নি, সেই অস্থিরতাই তাঁকে কালিকলম নিয়ে বসিয়ে দিয়েছে 'নয়নপুরের মাটি' লিখতে। সেটা ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দ, আর শেষ করেছিলেন অস্ত্রকারখানায় অবকাশের সময়ে বসে। ১৯৪৫, মাত্র একুশ বছর বয়সে 'আদাব' লিখেছিলেন এরও অনেক আগে কিন্তু মুদ্রিত হয়েছিল অনেক পরে ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পরিচয়' পত্রিকায়। 'আদাব'ই তাঁর প্রথম মুদ্রিত গল্প। অজ্ঞাতনামা এক লেখক প্রথম আবির্ভাবেই সাহিত্য সমাজে সাড়া ফেলেছিলেন। একটি গল্পেই ব্যাপক পরিচিতি এমনটি অবশ্য হয়নি। বিশেষত বামপন্থী সাহিত্যমহলে তিনি বিশেষ সাড়া ফেলেছিলেন। এই গল্পের মাধ্যমেই তিনি সাহিত্য জগতে প্রথম পা ফেলেছিলেন। এরই সঙ্গে একটা ব্যাপার ঘটে গিয়েছিল — এই অজ্ঞাতনামা লেখক পরিচিতি পেয়েছিলেন সমরেশ নামে। সমরেশ বসু, এই নামেই তিনি 'আদাব' লিখেছিলেন। স্বভাব অস্থির সুরথনাথ সমরেশে হারিয়ে গেলেন। না, ঠিক হারাননি, একটু ঢাকা পড়ে গিয়েছিলেন।

'নয়নপুরের মাটি' সমরেশ বসু প্রথম লিখেছিলেন কিন্তু সর্বজনসমক্ষে প্রথম আলো দেখেছিল 'উত্তরঙ্গ'। 'উত্তরঙ্গ'ই সমরেশ বসুর প্রথম মুদ্রিত উপন্যাস। এটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল 'বুক ও ওয়ার্ল্ড' প্রকাশনী থেকে। শচী সেন ছিলেন এর প্রকাশক। ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে 'উত্তরঙ্গ' প্রকাশের পর থেকে আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি। ছুটির অবকাশে বা কাজের অবকাশে পার্টির কাজে বা ট্রেড ইউনিয়নের কাজে গঙ্গা তীরবর্তী অঞ্চলে যে চটকল শ্রমিকদের বস্তি আছে সেগুলোতে সমরেশ বসু ঘুরে বেড়াতেন। তাদের সঙ্গে নানান ধরনের গল্প করতে করতে তাদের জীবনায়নের সঙ্গে ধীরে ধীরে পরিচিত হচ্ছিলেন, ওদের জীবনপ্রণালী নতুনভাবে সমরেশ বসুর চোখে উঠে এসেছিল। তাঁর এই নতুন করে দেখা সমাজজীবনকে আরও আলোকিত করে দিয়েছিলেন চটকল শ্রমিক 'নবকুমার দাশ'। যিনি পনের বছর বয়সে চটকল শ্রমিক হয়ে ঢুকেছিলেন গত শতাব্দীতে। তাঁর মুখে গত শতাব্দীর চটকলগুলোর দোর্দণ্ডপ্রতাপশালী সর্দারদের কথা, সাহেব-মেমদের কথা শুনতে শুনতে 'উত্তরঙ্গ' লেখার চিন্তা তাঁর মনের অবচেতনে কাজ করতে থাকে। বামপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকার সময় ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে তিনি গ্রেফতার হয়ে যান ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বরে। সাতদিন প্রেসিডেন্সি জেলের নারকীয় সেলে ছিলেন। এরপরে ইয়োরোপীয়ান ওয়ার্ডের সেলে, তারপরে অন্য ওয়ার্ডে। পার্টি তার ওপরে অসন্তুষ্ট হয়েছিল। জেল কমিটি জানিয়েছিল তিনি বহিষ্কৃত বা সাসপেন্ডেড ব্যক্তি — এইরকম একটা নির্দেশ বাইরের পার্টি থেকে এসেছে তাই তাঁকে পনের নং ওয়ার্ডে থাকতে হবে। জেল কর্তৃপক্ষ

অবশ্য সেই নির্দেশ দেখাতে পারেনি। তারা তাঁকে তারপরে অন্য ওয়ার্ডে রেখেছিল। এই একটি ঘটনা ও অন্য কমরেডদের কিছু আচরণ সমরেশ বসুকে সচেতন করে তুলেছিল, কিন্তু লাভও হয়েছিল। তাঁর চিন্তার জগৎ প্রসারিত হয়েছিল। এই জেলে কাটানোর সময় তাঁর মনের মধ্যে 'উত্তরঙ্গ'-এর জন্য টুকরো টুকরো ঘটনা তিনি লিখতে শুরু করেছিলেন। নাটক 'লেবার অফিসার'ও লিখে ফেলেছিলেন। 'নাটক' এবং 'উত্তরঙ্গ'-এর জন্য লেখা টুকরো টুকরো অংশগুলো জেলেরই এক কর্মীর সাহায্যে জেলের বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর স্ত্রীর কাছে। জেলেই গণনাট্য সংঘের সম্পাদক নিরঞ্জন সেনের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। জেল থেকে বেরোনোর পরে ইছাপুর রাইফেল্‌সর ট্রেসারের চাকরিটি আর ফিরে পাননি। যখন জেলে ছিলেন তখন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় দেড়শ টাকা করে মাসোহারার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন; জেল থেকে বেরোনোর পর সেটিও বন্ধ হয়ে যায়। চরম আর্থিক কষ্টের মধ্যে পড়ে নিরঞ্জন সেনের ছোট ভাই শচী সেনের কাছে 'নয়নপুরের মাটি'র পাণ্ডুলিপিটি প্রকাশের জন্য নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু শচী সেনের 'নয়নপুরের মাটি' পছন্দ না হওয়ায় তিনি 'উত্তরঙ্গ'-এর বিষয়বস্তু নিয়ে কথা বলেছিলেন।

কাহিনী শুনে শচী সেন সমরেশ বসুকে 'উত্তরঙ্গ' লেখার জন্য উৎসাহিত করেছিলেন। কিন্তু উপন্যাস লিখতে একটু সময় লাগবে, তারপরে তো প্রকাশ। কম করেও দু'তিনমাস সময় লেগে যাবে। বন্ধুদের সাহায্য ও স্ত্রী গৌরীদেবীর সেলাই-এর সামান্য আয় থেকে কোনমতে অনাহারের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া, এই চরম দুরবস্থার কথা শচী সেনকে বলতেই হয়েছিল। শচী সেন তিনমাসে পঞ্চাশ টাকা করে দিতে রাজি হয়েছিলেন। কিন্তু তিনিও একসঙ্গে টাকা দিতে পারতেন না, অল্প অল্প করে দিতেন; তিনমাস পরে সেটাও দিতে পারেন নি। 'উত্তরঙ্গ' ছাপা শেষ হয়ে গিয়েছিল তাই শচী সেন দপ্তরীর ঘর থেকে বই নিয়ে বিক্রি করে টাকা নিয়ে যেতে বলেছিলেন। পরের দিন এত বৃষ্টি হয়েছিল যে হাঁটুজল জমে গিয়েছিল। সমরেশ বসু মানিকতলার রেললাইনের ধারে দপ্তরীর ঘর থেকে বই নিয়ে বেরোতে পারছিলেন না। বৃষ্টি একটু কমতেই গায়ের জামা খুলে বইগুলো ঢেকে 'নৈহাটী বাসন্তী কেবিন'-এ চলে এসেছিলেন। সেখানে বন্ধু সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া উমাশঙ্কর গাঙ্গুলি, সত্যজিৎ চৌধুরী, প্রভাত বন্দ্যোপাধ্যায়, কনিষ্ঠ বন্ধু রমেশ দে — এরকম আরও অনেকেই সমরেশ বসুর প্রথম প্রকাশিত বই 'উত্তরঙ্গ'-এর জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। বন্ধুদের উষ্ণ অভ্যর্থনায় 'নৈহাটী বাসন্তী কেবিন' মুখরিত হয়ে উঠেছিল। আর সমরেশ বসু আনন্দে সারারাত 'প্রথম ছাপা' বই বুকে নিয়ে ঘুমিয়েছিলেন। 'উত্তরঙ্গ'-এর সাফল্য এতটাই ছিল যে ন'মাসেই প্রথম সংস্করণ শেষ হয়ে যায়। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল 'ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী'র মাধ্যমে। শর্ত ছিল শতকরা পনের ভাগ রয়্যালিটির পুরো একটি সংস্করণের টাকা, কিছু অগ্রিম টাকা ও একটি গল্পের বই 'অকালবৃষ্টির জন্য'। এর ফলে অন্ন চিন্তার সমস্যা মিটে

31 MAR 2016
278429

গিয়েছিল, আর লেখাকেই পেশা করবার চিন্তাটা মনের মধ্যে দৃঢ়মূল হয়ে বসেছিল।

'উত্তরঙ্গ'-এর সাফল্যে কবি বিষ্ণু দে তাঁকে চিঠি দিয়ে প্রথম অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। তিনি কী লিখেছিলেন সে সম্পর্কে সমরেশ বসু তার 'নিজেকে জানার জন্য' রচনাটিতে লিখেছেন এইভাবে 'তাঁর দুটি কথা আমি এখনো মনে রেখেছি। এক 'আপনার উপন্যাসটি পড়ে মনে হলো, রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের ভাষার সঙ্গে সঙ্গে আপনার পরিচয় অতি ক্ষীণ।' দ্বিতীয় 'আরো লিখুন; গঙ্গার ধারের যে কথা আপনি লিখেছেন আপনাকে দেখতে চাই তার সাগর সঙ্গকে।' ... *(পৃ: ২৭, 'দেশ' সমরেশ বসু স্মরণে)* সিগনেটের দিলীপ গুপ্ত একটি ফাউন্টেন পেন ও ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'সংবাদপত্রে সে-কালের কথা'র দুটি খণ্ড উপহার দিয়েছিলেন। 'উত্তরবঙ্গ'-এ সমালোচনা বেরিয়েছিল 'পরিচয়' পত্রিকায়। চিন্মোহন সেহনাবীশ সমরেশ বসুকে অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত করেছিলেন। তাঁর বন্ধু অধ্যাপক সনৎ বসু 'নতুন সাহিত্য' পত্রিকায় চিন্মোহন সেহনাবীশের সমালোচনার উত্তর দিয়েছিলেন। 'নতুন সাহিত্য'-এ পরের সংখ্যায় আবার সমালোচনা করেছিলেন অচ্যুত গোস্বামী; আর তার পরের সংখ্যায় প্রতি-সমালোচনা করেছিলেন গান্ধী ও বানার্ডশ-এর জীবনীকার ঋষি দাস। ঋষি দাস 'ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী'র প্রহ্লাদ প্রামাণিকের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছিলেন। 'মরশুমের একদিন' গল্প সংকলনটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে প্রহ্লাদ প্রামাণিকের প্রচেষ্টায়। ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে 'বি. টি. রোডের ধারে' ও তার লেখা প্রথম উপন্যাস 'নয়নপুরের মাটি' প্রকাশিত হয়েছিল। এরপরে ১৯৫৩-তে 'চতুষ্কোণ' পত্রিকা 'শ্রীমতী থেকে কাফে' এবং এর পাশাপাশি ছোটগল্প 'অকাল বসন্ত' ১৯৫২ তে ও 'সোনাটার বাবু' ১৯৫৩ তে প্রকাশিত হয়েছিল। কালকূট নামে 'ভোটদর্পণ'-এর কথা আগেই বলা হয়েছে।

'নয়নপুরের মাটি' উপন্যাসটি তাঁর বিধ্বস্ত জীবনে পায়ের তলায় মাটি খুঁজে পাওয়ার প্রথম প্রয়াস, তাঁর মনের রুদ্ধদ্বার খুলে দিয়েছিল সাহিত্যের দরজার প্রথম সোপানে পা রাখবার। গ্রামীণ পটপরিবেশে বেড়ে ওঠা কৃষক সন্তান হয়ে যায় পুতুল গড়ার শিল্পী। গ্রামীণ জীবন তার স্বাধীনতার সুরে বাঁধা, মাটি তার সেই শিল্পীমনকে বিকশিত করে। তার শিল্প প্রশংসিত কিন্তু নিজে উপহসিত। নায়িকা এসেছে শহর থেকে; এসে তাকে শহরে নিয়ে যেতে চায় খ্যাতির জগতে পৌঁছে দেওয়ার জন্য। সামন্ততান্ত্রিক সমাজজীবনে স্বৈরতন্ত্র গ্রামীণ মানুষকে নিষ্পেষিত করতে থাকে, কখনও ধর্মের নামে, কখনও ফসল লুট করে, কখনও রক্তে হাত রাঙা করে। মানুষের অধিকার লুণ্ঠিত হয়, গ্রাম জীবনে ধ্বংসের প্রতিধ্বনি শোনা যায়, গ্রাম ছেড়ে ভীতসন্ত্রস্ত মানুষ শহরমুখী হতে চায়। নায়ক নয়নপুরের মাটি আঁকড়ে ধরে তাঁর শিল্পীমনের পরিবর্তন করে সংগ্রামী জীবনের ডাক দেয়। গ্রামীণ জীবনের ও নাগরিক জীবনের যে টানাপোড়েন তাই আছে 'নয়নপুরের মাটি'তে। 'বি. টি. রোডের ধারে' বস্তিজীবনের কথা; ভিন্ প্রদেশের মানুষের বস্তি জীবনের কথা তুলে ধরেছেন। ছোট বস্তির

বাড়িওয়ালা মালিকের বিষয়সম্পত্তি বড় বস্তির মালিক আইনের ফাঁদ পেতে গ্রাস করতে উদ্যত। ছোট বস্তির মালিকের আস্ফালিত হৃদয়ে কোমলের সন্ধান, সে নিজেই জানে না তাঁর রাজ্যপাট দাঁড়িয়ে আছে ভুয়ো জমির ওপরে। গোবিন্দ ওরফে ফোরটোয়েন্টি অনেকদিন নিরুদ্দেশ থাকার পর ছদ্মবেশে হঠাৎ করে বস্তিজীবনে এসে ভূতভবিষ্যতহীন মানুষগুলোর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। তার চোখ দিয়ে বস্তিজীবনের বিভিন্ন চরিত্রের নানা দিক উন্মোচন করা হয়েছে। ভূমিহীন মানুষেরা খোলার চালটুকু বাঁচানোর জন্য একক লড়াই করে, কিন্তু কিছুই বাঁচাতে পারে না, না নিজেকে না বস্তিকে। লেখক গোবিন্দর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সংঘশক্তির জন্মের সংকেত দিতে চেয়েছেন। লেখকের নিজ রাজনৈতিক ছায়া আছে 'গোবিন্দ' চরিত্রটিকে। এরকম অনেক কাহিনীতেই নিজের জীবনের রাজনৈতিক বিশ্বাস ও বিশ্বাসভঙ্গের টানাপোড়েনে অনেক কাহিনী লিখেছিলেন। বিশেষ সংখ্যা 'দেশ' সমরেশ বসু স্মরণে 'সমরেশ : আদরা বনাম খসড়া' তে আনন্দ বাগচী 'বি. টি. রোডের ধারে' সম্পর্কে বলেছেন, বর্ণনার গুণে, অজানা পরিবেশের টানে নাটুকে বিন্যাসে আর যৌনবোধের আলোছায়ায় বি. টি. রোডের ধারে টান টান হয়ে আছে। 'দিন শেষ হতে না হতেই রাত্রি নেমে এল। সারাদিনের ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ ছড়ানো আকাশটার এ মুড়ো থেকে ও মুড়ো পর্যন্তকে যেন দিগন্তহীন আলকাতরার ব্রাশ নিয়ে গেল বুলিয়ে।' উপন্যাসের এই সূচনা-ভাষ্যটির চিত্রকাব্যিক ভাষায় শরৎচন্দ্রের অস্পষ্ট আদল থাকলেও সমরেশের কলম যে আড়ভেঙে গল্পরসকে ধরতে অনেকটা এগিয়ে এসেছে তাতে সন্দেহ নেই।'' *(পৃ: ৪৭, দেশ, সমরেশ বসু স্মরণে)*

এরপরে 'শ্রীমতী কাফে', 'নৈহাটী বাসন্তী কেবিন'-এর ছায়ায় তিনি সৃষ্টি করেছেন। এই উপন্যাসে তিনি ১৯২০ থেকে ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত মধ্যবিত্ত সমাজের ব্যক্তিমানস, গান্ধীবাদ সন্ত্রাসবাদ সব কিছুই তুলে ধরেছেন। বাসন্তী কেবিনে আড্ডা দেওয়া মানুষগুলোকে পরিবর্তিত রূপে তুলে ধরেছেন 'শ্রীমতী কাফে' তে। তাই বাসন্তী কেবিনের মালিক হরি লাট (হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়) হয়ে যান শ্রীমতী কাফের ভজু লাট। তাঁর চোখ দিয়ে স্বাধীনতার পূর্বের এবং সদ্য স্বাধীন হওয়া একটি রাষ্ট্রের রাজনৈতিক অস্থিরতা, অগ্নিগর্ভ, সমস্যাসঙ্কুল সময়কে তুলে ধরেছেন। 'শ্রীমতী কাফে' সমরেশ বসুর প্রথম দিকের উপন্যাস হলেও পাঠককুলে যথেষ্ট সাড়া ফেলেছিল। 'শ্রীমতী কাফে'র কুশীলবদের প্রভাব পরবর্তী কিছু কিছু উপন্যাসেও পড়েছে। দশকে দশকে সমরেশ বসু তাঁর উপন্যাসের দিক বদল করেছেন। ১৯৫১ থেকে ১৯৫৩ পর্যন্ত চারটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। 'শ্রীমতী কাফে' রাজনৈতিক উপন্যাস লেখার পরপরই তার মনের কোণে সেই সুরথনাথ উঁকি দিতে থাকে। একদিকে সুরথনাথের হাতছানি আর একদিকে প্রয়াগে কুম্ভমেলার প্রস্তুতি পর্বের ঘোষণা। 'গাহে অচিন পাখি'তে কালকূট বলেছেন আমার চোখের সামনে এঁকে দিল একটি ছবি। প্রয়াগের ত্রিবেণী সঙ্গমে মহামানবের মেলা বলতে কি, কেমন একটা শিহরণ ঢেউ দিল

প্রাণে। বাঁশির ডাক শুনতে ভুল হল না। সারা দেশের মূর্তিখানি যদি দেখতে হয়, তবে সেই মেলার প্রাঙ্গণে চলো। কী করে বোঝাবো সেই ব্যাকুলতা। তেমন কথা আমার জানা নেই, কেবল মনে হতে লাগল, বড় অন্ধকারে আছি। চোখ ভরে দেখা হয়নি আপন রূপেরই বিস্তৃতিকে। "এখন উপায়? কড়ি চাই কড়ি। পারানির কড়ি। পাই কোথায়।" *(পৃ: ৩২, 'গাহে অচিন পাখি', কালকূট রচনা সমগ্র ১ম খণ্ড)*

কিন্তু কেমন করে? রেলগাড়িতে ভাড়া লাগে। ঘোরাফেরাতেও খরচা কবুল করেছি আগেই, পকেট শূন্য, অন্ন বাড়ন্ত ঘরে। কিন্তু সন্ন্যেসী বিবাগী তো নই। ঝোলাঝুলি কাঁধে নিয়ে, জয়গুরু বলে বেরিয়ে পড়ার উপায় নেই। আমি তীর্থযাত্রীও না। ভিন্ চালের টান আমার, সঙ্গম টেনেছে আমাকে, আমার দেশের নানা রূপের এক মূর্তি ধরে। মূর্তির হাতছানি দিয়ে। আমার নিজের পরিচয় যে সেখানে রয়েছে।

এ'কথাগুলো কালকূট লিখেছেন 'গাহে অচিন পাখি' তে, সমরেশ বসু সৃষ্ট দ্বিতীয় সত্তা। কুম্ভমেলার হাতছানিতে সমরেশ বসু মোহগ্রস্ত হয়ে পারানির কড়ি খুঁজতে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। অগ্রজ সাহিত্যিক মনোজ বসু তাঁকে একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন 'যুগান্তর' পত্রিকার পরিমল গোস্বামীর কাছে। উত্তর বাগবাজারের 'শিশির ইনস্টিটিউট'-এ একতলার একটি ঘরে টেবিলের উপর কিছু লেখালেখি করছিলেন। ব্যস্ত মানুষকে বিরক্ত করা উচিত হবে না মনে করেও মনোজ বসুর চিঠিটি তার হাতে তুলে দিয়েছিলেন। পরিমলবাবু চিঠিটি পড়ে একপাশে সরিয়ে রেখে মুখ না তুলেই বাঁ হাত নেড়ে দিয়েছিলেন। সমরেশ বসু হাত নাড়ার কারণটা বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে 'মনোজদাকে তাহলে ...।' *(পৃ: ৩২, ঐ)* কথাটা আর শেষ করতে হয়নি, আরও দ্রুত হাত নাড়িয়ে তিনি দরজা দেখিয়ে দিয়েছিলেন। যার অর্থ একটাই দাঁড়ায় তফাত যাও। বুকের মধ্যে মোচড়ানো ব্যথা আর ঝাপসা চোখে ফিরে এসেছিলেন মনোজ বসুর কাছে। অপমানিত সমরেশ বসুর কথায় মনোজ বাবু বিমর্ষ হয়ে অনেক কথা বলেছিলেন, এবং আশ্বাস দিয়েছিলেন যে পরের দিন দক্ষিণারঞ্জন বসুর কাছে তাকে পাঠাবেন আর একটা চিঠি দিয়ে যাতে উনি একটা ব্যবস্থা করে দেবেন। মনোজ বাবুর কাছ থেকে বেরিয়ে পবিত্র গঙ্গে াপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। ব্যাপারটা শুনে উনিও দুঃখ পেয়েছিলেন এবং বলেছিলেন "ওসব মনে রাখিস না। তোর ভেতরে জিনিস থাকলে তা চেপে রাখবে কে? আমার উপায় থাকলে এখুনি তোকে এলাহাবাদ পাঠাবার ব্যবস্থা করতাম। এখন আমার আর সেদিন নেই।" *(পৃ: ৩২, ঐ)* আর্মহার্স্ট স্ট্রীট আর হ্যারিসন রোডের মাঝে কথাগুলো শুনে সমরেশ বসুর চোখ ঝাপসা হয়ে উঠেছিল। গভীর রাতে গৌরী দেবীর সঙ্গে আলোচনা করে পরদিন 'জয় মা' বলে বর্মন স্ট্রীটে 'দেশ' পত্রিকার অফিসে সাগরময় ঘোষ মহাশয়ের ঘরে গিয়ে ঢুকেছিলেন। সাগরময় বাবুর সঙ্গে

সমরেশ বসুর সামান্য পরিচয় ছিল। পিলে চমকানো তাঁর আচরণ নয়, কিন্তু মুখের রেখা দেখে বোঝা যায় না প্রসন্ন না অপ্রসন্ন। সাগরময় বাবুর মুখোমুখি চেয়ারে বসে আছেন খদ্দেরের ধুতি পাঞ্জাবি পরা, ছোট করে কাটা চুল, শক্ত স্বাস্থ্যবান ব্যক্তি। এনাদের সঙ্গে সমরেশ বসুর কথাবার্তা হওয়ার আগে একটু অন্য প্রসঙ্গ বলে নেওয়া যাক। এই সময়ে অর্থাৎ ১৯৫৪ সালের শেষ দিকে আঁতপুরের বাসা ছেড়ে সমরেশ বসু সপরিবারে নৈহাটী উঠে এসেছিলেন। দু'খানি থাকার ঘর, টালিতে ছাওয়া, রান্নাঘরে ঢুকতে গেলে মাথা ঠেকে যায়। ফণী মনসা রাং চিতার বেড়া দিয়ে বাড়ীটা ঘেরা। এর পূর্ব-দক্ষিণ ঘিরে বাজার আর পশ্চিম-উত্তরে খাপরা, টালির ছাওয়া ঘনবস্তি। বাড়ীর সামনে ফাঁকা জমিটাতে বাজারের সব জঞ্জাল জমা করা হয়। বৃষ্টিতে এক হাঁটু জল দাঁড়িয়ে যায় রান্নাঘরে, আর সামনেই একটা ভাঙা খাটা পায়খানা। এই ঘরে ছোট একটা টুলে বসে 'সওদাগর' উপন্যাস লেখা হচ্ছিল সেই সময়ে। শুধু বই লিখে সংসার চালানো একটু কষ্টসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল সমরেশ বসুর পক্ষে। চারটি বাচ্চা ও পত্নীসহ সংসারটিও ছোট ছিল না। তাই অন্ন চিন্তার তাগিদে আঁতপুরে থাকতেই আনন্দবাজার পত্রিকায় পনেরো দিন অন্তর 'শহরতলীর পথে' একটি ফিচার ধরনের লেখা পাঠাতেন। গঙ্গার ওপারে গুপ্তিপাড়া থেকে বালী আর এপারে কাঁচরাপাড়া থেকে দমদম পর্যন্ত প্রত্যেকটি পৌর অঞ্চল ধরে, সেইসব স্থানের খুঁটিনাটি তথ্য ফটো সহ এই ফিচার ধরনের লেখা। সোমনাথ ভট্টাচার্য ও সমরেশ বসু সারা শহর ঘুরে পৌর অঞ্চল, স্কুল-কলেজ, মন্দির-মসজিদ-গির্জা সৌধ-দিঘির ছবি, খুঁটিনাটি তথ্য যোগাড় করে ও কোনো বৃদ্ধ মানুষের কাছ থেকে পুরনো দিনের কথা জেনে নিয়ে এই ফিচারগুলো লিখতেন। কিন্তু 'শহরতলী পথে'র উপাদান ফুরিয়ে আসতেই আনন্দবাজার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে 'অতীত দিনের প্রসঙ্গে' লিখতে শুরু করেছিলেন। পুরনো দিনের মানুষের সঙ্গে কথা বলে তাদের কয়েকজনের সম্বন্ধে লেখা শুরু করেছিলেন। প্রথম প্রসঙ্গ ছিল, নৈহাটীর জগা, উড়িষ্যার মানুষ। থুত্থুরে বুড়ো, কথা ঠিকমতো বোঝা যায় না। তিনমাথা এক। "তার দাবী কিশোর বয়সে সে সাহিত্য সম্রাটকে দেখেছে। তাঁর বাড়ির ভৃত্য ছিল। কোনো পাথুরে প্রমাণ নেই। তবুও সমরেশদা তাকে দিয়েই শুরু করলো। 'অতীত দিনের প্রসঙ্গে'। পর পর আরো ..." *(পৃ: ৮১, সখা কথা রাখেনি, সোমনাথ ভট্টাচার্য, দেশ, সমরেশ বসু স্মরণে)* ঠিক এইরকম সময়েই কুম্ভমেলায় যাওয়ার জন্য বাঁশির সুর শুনেছিলেন। মন আর ঘরে রয় না সমরেশ বসুর। এক জায়গায় পারানির কড়ি ব্যবস্থা করতে গিয়ে অপমানিত। এবার মনে অনেক আশা নিয়ে সাগরময় বাবুকে নমস্কার করে তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন দুরু দুরু বক্ষে। কেউ কোনো কথা না বলে নির্বিকার ছিলেন। শেষে বাধ্য হয়ে আমতা আমতা করে তাঁর উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছিলেন। সমরেশ বসু লক্ষ্য করেছিলেন তাঁর কথা শুনতে শুনতে সাগরবাবু আর ভদ্রলোকটি দু'জনে দু'জনার দিকে তাকাচ্ছিলেন। কথা শেষ হতেই

সাগরময় বাবু কানাইলাল বাবুর সঙ্গে সমরেশ বাবুর পরিচয় করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতেই তিনি গর্জিত স্বরে বলে উঠেছিলেন "গুড। ভেরি গুড আইডিয়া। কী বল সাগর?" *(পৃ: ৩৩, গাহে অচিন পাখি, কালকূট রচন সমগ্র ১ম খণ্ড)* সাগরময় বাবুও উত্তরে জানিয়েছিলেন যে — তারও প্রস্তাবটা ভালোই লেগেছে। তিনি কানাইলাল সরকারের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। প্রতি নমস্কার জানিয়ে "কানাইবাবু মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন 'আপনি চলে যান এলাহাবাদ, আমরা আপনার লেখা ছাপব। দেশে নয় আনন্দবাজারে। আপনি কুম্ভমেলায় যেতে চান, দেখতে চান শুনে খুব ভাল লাগল। আমি খুশি হয়েছি। আপনি যান, দেখুন আর আমাদের সংবাদ দিন। ফটো তুলতে পারেন?" *(পৃ: ৩৩, ঐ)* আমার অবস্থা তখন কাকেই বা কী বোঝাব। খুশিতে প্রাণ ডগমগ হতে হতেই ঝপ্। তবু বলে ফেললাম, 'পারি। বক্স ক্যামেরায়।'

কানাইবাবুর মুখে বিদ্যুৎ ঝলকের মতো একটু হাসি দেখা গেল। সাগরবাবুর দিকে একবার তাকালেন। সাগরবাবুর টেপা ঠোঁটেও কি হাসির ঝিলিক? কানাইবাবু বলে উঠলেন, 'ওতেই হবে।'

আমরা নেগেটিভ দেখে শুনে প্রিন্ট করে নেব। আপনি — হ্যাঁ ওখানে গিয়ে এক কাজ করবেন। আপনি নিশ্চয়ই মেলায় মেলায় ঘুরবেন?'

আমি ঘাড় কাত করে বললাম 'হ্যাঁ, তাই তো যাচ্ছি।'

'বেশ, ভেরিগুড।' কানাইবাবু নড়েচড়ে বসে বললেন, 'আপনি যা দেখবেন— আই মীন, বিশেষ বিশেষ সব ঘটনা, রোজ একটা ইনল্যান্ড খামে লিখে পাঠাবেন। আমরা সেগুলো সংবাদ করে ছাপব। আমরা আপনার প্রত্যেকটি চিঠির জন্য— ইয়ে (এক মুহূর্ত মুখ বুজে ভাবলেন, ভ্রূকুটি চোখের তারা এক কোণে বিদ্ধ হল, তারপরেই) হ্যাঁ, কুড়ি টাকা করে দেব। টুয়েনটি রুপিজ, অ্যাঁ কী বলো সাগর?'

সাগরবাবু বললেন 'হ্যাঁ, ভালই তো।'

কানাইবাবু আমার দিকে ফিরে বললেন, 'আপনি ফিরে এসে আর্টিকেল টার্টিকেল গোছের যা লিখতে চান, লিখবেন, আনন্দবাজারের লাস্ট পেজে ছাপা হবে।'

আমি তো যেন বাসরঘরের বউ। যেমন আনন্দ, তেমনি ভয়। গলার স্বরই যে গর্জানো।" *(পৃ: ৩৩, ঐ)*

সমরেশ বসু কানাইবাবুকে অ্যাডভান্সের কথা বলাতে উনি বলেছিলেন যে সেই মুহূর্তে টাকা দেওয়া সম্ভব নয়, ফিরে এলেই টাকা পেয়ে যাবেন। একথা শুনেই সমরেশ বসুর আনন্দ মুহূর্তেই মিলিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কানাইবাবুই আবার আশার আলোও জ্বেলে দিয়েছিলেন। এলাহাবাদে কবি অরুণ মিত্রকে তিনি একটা চিঠি লিখে দেবেন, ওনার সঙ্গে দেখা করলেই উনি তাকে সবরকমের সাহায্য করবেন। সাগরময় বাবু সমরেশ বসুর নিঃস্বতার কথা বুঝতে পেরে বলেছিলেন যে

কানাইদার উপায় থাকলে নিশ্চয়ই দিতেন। কারও কাছে ধার করে এলাহাবাদ চলে গেলেই অরুণ মিত্র সব ব্যবস্থা করে দেবেন। সমরেশ সেদিনই সাগরময় বাবুর কাছে জেনেছিলেন যে কানাইবাবুই আনন্দবাজার পত্রিকার সব কিছু পরিচালনা করেন। অতএব আর কী করা। বন্ধুদের কাছে টাকা ধার করে ও বক্স ক্যামেরা চেয়ে নিয়ে মেজদার দেওয়া রেল কোম্পানীর গরম ওভারকোটটি নিয়ে ঝুলি কাঁধে বেরিয়ে পড়েছিলেন। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে ফরাসী ভাষার অধ্যাপক অরুণ মিত্রর আতিথ্য গ্রহণ করে একটি সাইকেল ভাড়া করে মেলায় ঘুরে বেড়িয়েছিলেন রোজকার মেলার বিবরণী ফটোসহ পাঠাবার জন্য। শুরু হয়েছিল নতুন পথে চলা। ফটো তুলতে গিয়েও আর এক বিপদ, কোতোয়ালজী মেলার থানায় নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। শেষে এক জটাধারী সাধুজীর কথায় কোতোয়ালজী ছেড়ে দিয়েছিল। তবু সমরেশ বসু লুকিয়ে ফটো তুলেছিলেন পত্রিকায় পাঠানোর জন্য। কুম্ভমেলায় আসা সারা ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষের ভাষা-পোশাক-খাদ্য-ধর্মীয় আচরণ, পুরান-ইতিহাসের স্মৃতি, গঙ্গা-যমুনা নিরন্তর দুই রঙে বয়ে যাওয়া, সরস্বতী গুপ্তধারা, কোথাও কোথাও ক্ষীণভাবে দৃশ্যমান, বিশাল বালুচর, পুরনো কেল্লা, সবকিছুই তার হৃদয়তন্ত্রীতে বৈরাগ্যের সুর তুলেছিল। মেলার শেষদিনের মহাশ্মশানের ভয়াবহ করুণ দৃশ্য ও ক্রন্দনধ্বনি তাঁর বিষবাহী প্রাণে অমৃতের তৃষ্ণা বাড়িয়ে তুলেছিল। প্রয়াগে জ্বলে উঠেছিল চিতার আগুন যা আকাশ ছুঁয়েছিল। বেদনার্ত হৃদয়ে মনে অশৌচ নিয়ে তিনি ফিরে এসেছিলেন। তাই অশৌচ কাটাতে কানাইলাল সরকারকে বলেছিলেন ''যদি আমার বিষবাহী প্রাণের অমৃত সন্ধানের কথা 'দেশ' পত্রিকায় একটু বিস্তৃত করে লেখবার অনুমতি দেন।'' *(পৃ: ৩৫, ঐ)*

কানাইবাবু খুশি মনে রাজি হয়ে বলেছিলেন যে, মনে হয় লেখাটা ভালই হবে। ইচ্ছে হলে ছদ্মনামেও লেখা যেতে পারে। সমরেশ বসুর মনে হয়েছিল পাথরের মুখের রেখা কাঁপছে আর সাগরময় বাবু বলেছিলেন ''লেখাটার একটা নাম ঠিক করে ফেলুন। চারটে কিস্তি লেখা হলেই ছাপা শুরু করা যাবে।'' *(পৃ: ৩৫, ঐ)* সমরেশ বসু 'কিস্তি' কথাটাও জীবনে সেই প্রথম শুনেছিলেন। ''শুরু হল যাত্রা, 'অমৃত কুম্ভের সন্ধানে'। কালকূট তার নামের সংজ্ঞার্থ খুঁজে পাচ্ছে।'' *(পৃ: ৩৫, ঐ)* ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে 'দেশ' পত্রিকায় ৯টি কিস্তিতে ধারাবাহিকভাবে লেখা হয়েছিল 'অমৃতকুভের সন্ধানে'; কালকূটের দৃষ্টিতে নতুন ধরনের রচনাশৈলীতে যা সমরেশ বসুর রচনাশৈলী থেকে আলাদা। সমরেশ বসুর সৃষ্ট তাঁর দ্বিতীয় সত্তা 'কালকূট'-এর সার্থক উত্তরণ ঘটেছিল। সমরেশ বসুতে বালক সুরথনাথের হারিয়ে যাওয়া মনটি সমরেশ বসুই ফিরিয়ে এনেছিলেন 'কালকূটের মাধ্যমে।' 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে'র অভূতপূর্ব সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে কালকূটের সাহিত্যিক খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। একই উৎস থেকে দুটি ধারা দু'দিকে চলতে শুরু করেছিল। কিন্তু কখনও কখনও দেখা গেছে দুটি ধারা প্রয়াগের গঙ্গা যমুনা ধারার মত একসঙ্গে চলেছে। সমরেশ বসুর শেষ

জীবনীমূলক উপন্যাস 'দেখি নাই ফিরে' তে 'সমরেশ বসু' ও 'কালকূট' হাত ধরাধরি করে চলেছে।

'কালকূট' রূপী সমরেশ বসু 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে' লিখেছিলেন নৈহাটীর এক অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে টালির ঘরে বসে— যে বাড়ি ও পরিবেশের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। 'দেশ' পত্রিকার 'সমরেশ বসু স্মরণে' বিশেষ সংখ্যাটিতে। সোমনাথ ভট্টাচার্য 'সখা কথা রাখেনি' তে সমরেশ বসুর বাড়ির পরিবেশ আরও বিস্তারিত করে লিখেছেন। তিনি বলেছেন — "বর্ণনা খুঁটিয়ে লেখার উদ্দেশ্য একটাই, আমাদের নৈহাটী শহরে এই পরিবেশে দুই মেয়ে, দুই ছেলেকে নিয়ে সস্ত্রীক বাসা বাঁধলেন, এ'যুগের বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক সমরেশ বসু। ওই টালির ঘরে বসে লেখা হল একটার পর একটা অসাধারণ ছোট গল্প, কয়েকটি সার্থক উপন্যাস। বাংলা সাহিত্যে কালকূটের আবির্ভাব হল 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে'র নৈবেদ্য হাতে নিয়ে।" *(পৃ: ৮০, দেশ, সমরেশ বসু স্মরণে)*

একদিকে মরমীয়া অন্বেষণ ও আর একদিকে রাজনৈতিক অন্বেষণ একই কলমের দ্বৈতধারা। কালপ্রবাহের অন্তর্বর্তী স্রোতধারা বারে বারে বাঁক নিতে সাহায্য করেছে। 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে'র পর সমরেশ বসু ১৯৫৭ তে লিখেছিলেন 'গঙ্গা'। 'গঙ্গা'য় তিনি তাঁর লেখার পুরোনো ধারা ছেড়ে নতুন ধারায় গঙ্গার মতই গতিশীল করেছিলেন। এই উপন্যাসে উঠে এসেছে দক্ষিণবঙ্গের বিশেষ এক অঞ্চলের 'মাছমারা'দের কথা। যাদের জীবনের একভাগ থাকে ডাঙায় আর বাকি তিনভাগ থাকে জলে। 'মাছমারা'দের জীবনের বিচিত্র কাহিনী সমরেশ বসু অনেক কাছ থেকে নিকট আত্মীয়ের মত মাছমারাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মিশেছেন। প্রত্যক্ষ করেছেন তাঁদের জীবন-যন্ত্রণা, সেই অনুভূতি তিনি তুলে ধরেছেন 'গঙ্গা'য়। জীবিকাই হয়ে উঠেছে তাদের নেশা। নারী এসেছে তাদের জীবনে, আবার কুল ভেঙেছে নারী নদীর মতোই। 'মাছমারা'দের শিকারী জীবন কত অনিশ্চিত, ফাঁদ হাতে ধরা কিন্তু শিকার দৃষ্টির বাইরে; অভুক্ত ক্লান্ত শরীরে সেই শিকারের জন্য প্রতীক্ষা। শিকারী তার প্রিয়তমাকেও ত্যাগ করে 'মাছমারা'য় পূর্ণতা প্রাপ্তির নেশায়। হিমি বিলাসের প্রেমকাহিনীর প্রয়োজনেই এসেছে। বিলাসের চরিত্র কল্পনায় নতুনত্ব আছে। 'মাছমারা'দের অনিশ্চিত জীবনের সঙ্গে মৃত্যুচেতনা কাহিনীকে চিরকালীন করেছে। 'গঙ্গা' উপন্যাসের জন্য সমরেশ বসু ১৯৬৭ তে আনন্দ পুরস্কার পান। ১৯৬০-এ লিখেছিলেন 'বাঘিনী'। বুর্জোয়া-লুম্পেন সমাজের কৃত্রিম গোষ্ঠী জীবনের কথা, স্মাগলারদের জীবনচিত্রের কথা তিনি চিত্রিত করেছেন। ১৯৬৬ তে তিনি লিখলেন 'জগদ্দল'। নৈহাটী জগদ্দল কেন্দ্রিক শিল্প অঞ্চলের শ্রমজীবী মানুষের কাহিনী ছিল উত্তরঙ্গ। ১৮৬০ থেকে ১৮৮১ এই বাইশ বছরের কাহিনীর উত্তরপর্বই হল 'জগদ্দল' উপন্যাস। লোকশ্রুতির সঙ্গে ইতিহাসের বহু প্রামাণ্য নথিপত্র থেকে তিনি এই বৃহৎ উপন্যাসটি লিখেছিলেন। আর ১৯৬৭ তে লিখেছিলেন সেই বিতর্কিত উপন্যাস 'বিবর'। 'বিবর' বাংলা সাহিত্যের মোড়

ঘুরিয়ে দিয়েছিল, নবযুগের সূচনা করেছিল। স্বকীয় বিশ্বাস ও সমাজ চেতনায় 'প্রজাপতি' (১৯৬৭) , 'স্বীকারোক্তি' (১৯৬৭), 'পাতক' (১৯৬৯), 'বিশ্বাস' (১৯৭১) উপন্যাসগুলি চূড়ান্ত রূপ পেয়েছিল লেখকের নায়ক ভাবনায়। সমাজের ভিন্ন ভিন্ন স্তর থেকে সৃষ্ট নায়কদের কেউ নিঃসঙ্গ , কেউ হতাশাগ্রস্ত, কেউ মারমুখী, কেউ প্রেমহীন মৌনতায় পীড়িত রাজনীতির জটিল আবর্তে দিশাহীন। ঘরে-বাইরের পঙ্কিল আবর্তে থেকে বেরিয়ে এসে বাঁচতে চাইছে কিন্তু আসতে পারছে না। রাজনীতির শিকারে পায়ের তলার মাটি সরে গিয়েছে। মুখের ভাষাকে ধারালো গালাগালে পরিণত করে আধুনিকতার অজুহাতে যৌনতা এনেছেন খোলাখুলিভাবে। 'বিবর' ও 'প্রজাপতি'র ভাষাকে অনেকেরই অশ্লীল বলে মনে হয়েছে। এই দুটি উপন্যাস সাহিত্যসমাজে প্রচলিত কাঠামোর মধ্যে নতুন ভাবনার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। এই পাঁচটি উপন্যাসে সমরেশ বসু হয়ে উঠেছেন দুর্বার, অপ্রিয় সত্যভাষী লেখক। 'বিবর' ও 'প্রজাপতি' সম্পর্কে সাহিত্যিক আনন্দ বাগচী বলেছেন 'দেশ' এর সমরেশ বসু স্মরণ সংখ্যায়, সমরেশ 'আদরা বনাম খসড়া'য় বলেছেন, 'নৈতিকতার প্রশ্ন শ্লীলতার প্রশ্ন বাংলা সাহিত্যের প্রচলিত কাঠামোর মধ্যে নতুন ভাবনার মুখোমুখী দাঁড়ানো।... বিবর-সাহিত্যের ফলকথা এই দাঁড়ালো যে বাংলা সাহিত্য পরিপার্শ্ব সচেতন হয়ে ওঠার সাহস সাবালকত্ব অর্জন করল রাতারাতি। এই নতুন রীতির উপন্যাস হয়ে থাকলো নতুন কালের এক স্থায়ী আদরা।" *(পৃ: ৫২, সমরেশ : আদরা বনাম খসড়া, দেশ, সমরেশ বসু স্মরণ সংখ্যা)* 'বিশ্বাস' (১৯৭১) উপন্যাসে নায়ক নীরেন তার পারিবারিক জীবন ও রাজনৈতিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন। দেশীয় কমুনিষ্ট পার্টির বিভাজন ও মতভিন্নতার কারণে যে সংঘাত সৃষ্টি হয়েছিল তারই চিত্র এঁকেছেন নায়কের বিশ্বাসভঙ্গের মত দিয়ে। ব্যক্তিজীবনেও তাঁর ঝড় উঠেছিল। উপন্যাসের নায়কদের মতো তাঁর সংসার জীবনেও ভাঙচুরের অনিবার্য ঘটনা ঘটে গেছে। ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দে তিনি গৌরীদেবীর বোন ধরিত্রী দেবীকে বিয়ে করেছিলেন। একদিকে গৌরীদেবী ও দুই পুত্র, দুই কন্যা আর একদিকে শ্যালিকা ধরিত্রী দেবীর সঙ্গে প্রেমের টানাপোড়েন। পাপপুণ্যে, ন্যায়-অন্যায়বোধ ধূলুণ্ঠিত। মূল্যবোধের অস্তিত্ব বিপন্ন। 'স্বীকারোক্তি' লেখা হয়েছিল দু'ভাবে — একটি ছোটগল্প আর একটি উপন্যাস। এই দুই 'স্বীকারোক্তি'র মাঝেই 'বিবর' সৃষ্টি করেছিলেন। স্বীকারোক্তি সম্পর্কে সমরেশ বসু 'নিজেকে জানার জন্যে' তে বলেছেন ''এক 'স্বীকারোক্তি' একটি ছোটগল্প, দুই বছরের ব্যবধানে আর এক 'স্বীকারোক্তি' আমার উপন্যাস। শ্রেষ্ঠতার আখ্যা? কেমন করে শ্রেষ্ঠ শব্দটাকে কবুল করি? কিন্তু স্বীকারোক্তির মধ্যে যেহেতু আত্মানুসন্ধানের এক নৈতিক ও মানসিক আর্তি রয়েছে, সেইহেতু আমার কাছে তার মূল্যের পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে।" *(পৃ: ২৯, দেশ, সমরেশ বসু স্মরণে)* সমরেশ বসু 'বিবর' সম্পর্কে নীরব থেকেছেন।

১৯৬৭ খৃষ্টাব্দে 'প্রজাপতি' উপন্যাসের জন্য অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত হয়েছিলেন ও

'প্রজাপতি' বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। ১৮ বছর পরে অশ্লীলতার অভিযোগ থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। এই সময়ে কালকূট লিখেছিলেন 'নির্জন সৈকতে' (১৯৬৩), 'স্বর্ণশিখর প্রাঙ্গণে' (১৯৬৬), 'কোথায় পাবো তারে' (১৯৬৮)। একদিকে মরমীয়া অন্বেষণ আর একদিকে রাজনৈতিক অন্বেষণ এই কলমের দ্বৈতধারা। কালপ্রবাহের অন্তবর্তী স্রোতধারা সমরেশ বসুকে বারে বারে বাঁক নিতে সাহায্য করেছে। সত্তরের দশক থেকে আশির দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত রাজনীতিকে লক্ষ রেখে আন্তর্জাতিক মানবতাবোধে লিখেছিলেন 'মানুষ শক্তির উৎস' (১৯৭৪), 'সংকট' (১৯৭৬), 'মহাকালের রথের ঘোড়া' (১৯৭৮) এবং 'যুগ যুগ জীয়ে' (১৯৮১) ইত্যাদি ইত্যাদি। উল্লেখযোগ্য সমস্ত উপন্যাসই রচিত হয়েছে সত্তর দশক থেকে আশির দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত। সমকালীন রাজনৈতিক পটপরিবেশ নানান বিপরীতমুখী ঘটনাস্রোতে উত্তাল, পুরোনো জাতীয় কংগ্রেসের তীব্র কমিউনিস্ট বিরোধিতায় যুবককুল দ্বিধাবিভক্ত, সন্ত্রস্ত, দিগ্‌ভ্রষ্ট, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে সংকট, কৃষক-শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে নয়া চেতনাবোধ জাগরিত। তারা বুঝতে পারছে না কোন্‌টা গ্রহণীয় কোন্‌টা বর্জনীয়। এক কথায় তারা বিভ্রান্ত। আর আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের নয়া প্রেক্ষাপটে দেশীয় কমিউনিস্ট আন্দোলন শতধা। যুবককুল সেই আবর্তে ঘূর্ণিপাক খাচ্ছে, তারা দিশেহারা। একদিকে গান্ধীবাদ আর একদিকে মার্কসবাদের সর্বৈব পটপরিবেশ সমাজ বিবর্তনের এই ধারাকে সামনে রেখে তার নিজস্ব চিন্তাধারাগুলো প্রকাশ করেছেন স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে। 'মহাকালের রথের ঘোড়া'র নায়ক রুহিতন কুরমি ছিল নকশালবাড়ি এলাকার চা বাগানের শ্রমিক। 'কৃষক আন্দোলনে' নেতৃত্ব দিয়েছিল নতুন কৃষক গড়বে বলে। এই সর্বহারা শ্রেণীর নায়ক রুহিতন কুরমি স্বপ্নের সওয়ারী হয়ে কারাবরণও করেছিল। কিন্তু কারাবাস থেকে বেরিয়ে এসে তার স্বপ্নভঙ্গ হয়েছিল পার্টির সদস্যদের অতিবিপ্লবী কার্যকলাপে। নয়া সংশোধনবাদীদের ভূমিকায় রুহিতন কুরমি আশাহত হয়েছিল। শ্রেণী শত্রুদের খতমের নামে মানুষকে অতর্কিতে খুন এসব মেনে নিতে পারেনি। জেলখানায় কুরমি কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হয়েছিল। কুষ্ঠ ব্যাধি প্রতীকী হিসাবে দেখিয়েছেন— সময়ের ব্যাধি। এই ব্যাধিতে কুরমি আক্রান্ত হয়ে নিঃসঙ্গ হয়ে যায়। দলের মতবাদের সঙ্গে সংঘর্ষে তার কালের রথের চাকা বসে গিয়েছিল। সেইখান থেকে সে একাকী সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিল হৃত মূল্যবোধ ফিরিয়ে আনার জন্য ও মানুষ খুনের নির্মম সন্ত্রাসবাদ রাজনীতির বিচারের আশায়। রুহিতন কুরমি বন্দুকের মুখে নিজেকে শেষ করে দেওয়ার মুখেও বন্দুকটা বুকের পাশে রেখে দেয় তাঁর একক সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মানসিকতায়। তার একক সংগ্রাম, প্রতিবাদকে বিশ্বমানবতায় পৌঁছতে চায়। 'মানুষ শক্তির উৎস'-এর মধ্যেও এই একই ধরনের বিভ্রান্তি এসেছে নায়কের মধ্যে। এখানেও নকশাল আন্দোলনে শ্রেণীশত্রু খতমের পরিকল্পনায় বিশ্বাসী ছিল খণ্ডিত কমিউনিস্ট পার্টির কোন কোন খণ্ডিত দলের সদস্যবৃন্দ। এখানেও লেখক নায়কের অন্তরে ওই হিংস্র রাজনীতিকে মানবতাবোধে

জাগরিত করতে চেয়েছেন। মানুষের নিরন্তর অসহায়তার বিরুদ্ধে যে শক্তি অহরহ তাঁকে প্রেরণা দেয় সেই শক্তিকে জাগরিত করাতে চেয়েছেন।

১৯৪২ থেকে ১৯৪৮ পর্যন্ত কংগ্রেসী মতবাদ ও কমিউনিস্ট মতবাদের যে নীতিগত পার্থক্য, সংঘর্ষ ছিল তারই ইতিহাস তুলে ধরেছেন লেখক। সেই রাজনৈতিক পটপরিবেশে নায়ক ত্রিদিবেশ সক্রিয়ভাবে রাজনীতির অংশীদার। এখানেও লেখক নায়কের মধ্য দিয়ে রাজনীতির সংকীর্ণতার উর্দ্ধে বিশ্বমানবতাবোধের কথা বলিয়ে নিয়েছেন প্রতীকী চিত্র-ব্যঞ্জনার মধ্য দিয়ে। আর 'শেকল ছেঁড়া হাতের খোঁজে' (১৯৮৪)-র নায়ক ও কমিউনিস্ট আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী। ভোটে নির্বাচিত হয়ে এম. পি. হওয়ার পরে জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন অর্থাৎ তাঁর শিকড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। কিন্তু তাঁর রাজনৈতিক স্বপ্নভঙ্গ হয়েছিল একদিন। সে শিকড় খুঁজে পাওয়ার জন্য আবার নিজ কর্মভূমিতেই ফিরে এসেছিল। এই সকল রাজনৈতিক উপন্যাস লেখার পরই সমরেশ বসু তাঁর সৃষ্টির গতিপথ ঘুরিয়ে নিয়েছিলেন আঞ্চলিক তাঁত শিল্পীদের দিকে। বিষ্ণুপুরের বালুচরী শাড়ির তাঁতিদের জীবনপ্রণালী নিয়ে লিখেছিলেন 'টানাপোড়েন' ১৯৮০ খৃষ্টাব্দে। 'বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা' গ্রন্থে শ্রী সত্যেন্দ্রনাথ বলেছেন 'ভূমিকা বা লেখকের কথার শেষ অংশে সমরেশ আমাদের জানিয়েছেন, "আমি চেষ্টা করেছি, বিষ্ণুপুরের তাঁত-শিল্পীদের জীবনযাপনের ছবি, মুখের ভাষা, ধ্যান-ধারণাকে রূপ দিতে।" এইখানেই তিনি বলেছেন যে এ উপন্যাসে "... এক প্রায়-গতায়ু শিল্পী-গোষ্ঠীর পরিচয়" তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। লেখকের এ কথাটা কিন্তু আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করা যায় না। টানাপোড়েন বিষ্ণুপুরের গোটা তাঁতি সমাজের পরিচয় নয়। বালুচরী তাঁতি সমাজের নয়। টানাপোড়েনে বিশেষ ক'রে নকশাশিল্পী এবং তাঁতি পাচু কীতেরই স্বপ্ন, চেষ্টা, কামনা-বাসনার পরিচয়ই আড়ালে চলে যায় নি। মানুষগুলিকে, তাঁদের কলহ-রসালাপকে, তাঁদের মুখের ভাষা ও মনের চেহারাকে সমরেশ এত জাজ্জ্বল্যমানভাবে উপস্থিত করেছেন যে তাদের প্রত্যেকের হাত ধরে খানিকটা ক'রে তাঁতিজীবন আসরে উঠে এসেছে।' *(পৃ: ২৬৬, * ঐ)*

বিষ্ণুপুরের বালুচরী শিল্পীদের বেঁচে থাকা আর অবলুপ্ত হয়ে যাওয়ার কাহিনীটি আসলে একটা গোটা শিল্পী-জাতির সঙ্কটের কাহিনী। একটিমাত্র তাঁতি পরিবারে বালুচরী শাড়ি তৈরি করে, পাঁচুকীত সে-ই 'বালুচর' শাড়ি শিল্পী, আর তার গুরু অভয় খান শুধু নকশা শিল্পী। তাঁর মৃত্যু জীব ও পাঁচুর আশাভঙ্গের মধ্যে কাহিনী শেষ হয়েছে। 'দেশ' সমরেশ বসু স্মরণে বিশেষ সংখ্যায় 'প্রিয় লেখক সমরেশ বসু' তে বোলান গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন, 'টানাপোড়েন-এর শেষ পঙক্তিটি সম্পর্কে বলেছেন, 'জীবন বুনে চল রই হে, জীবন বুনে চল্ বই' — আমার মনে যে সুরেলা ঝংকারে ধ্বনিত হয়েছে বাংলাসাহিত্যে তেমন আর কটি পংক্তিই বা আছে।" *(পৃ: ১৩৮, ঐ)*

এই সময়েই কালকূটরূপী সমরেশ বসু লিখেছিলেন 'বাণীধ্বনি বেণুবনে' (১৯৭০), 'হারায়ে সেই মানুষ' (১৯৭১), 'অমৃত বিষের পাত্রে' (১৯৭২), অরণ্য জীবনের ত্রয়ী উপন্যাস 'মন চল বনে' (১৯৭২), 'বনের সঙ্গে খেলা' (১৯৭৩), 'প্রেম নামে বন' (১৯৭৪), 'তুষারসিংহের পদতলে' (১৯৭৫), 'শাম্ব' (১৯৭৮)। 'আরব সাগরের জল লোনা' লেখাটি ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে 'জলসা' পত্রিকায় কিছুটা প্রকাশিত হয়ে বন্ধ হয়ে যায়। তার দশ বছর পরে আবার কিছুটা 'সাজঘর' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে বন্ধ হয়ে যায়। তারপর পূর্ণাঙ্গরূপে ১৯৭১ খৃষ্টাব্দে লেখাটি শেষ হওয়ার পরে ১৯৭২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল।

পৌরাণিক পথে চলতে গিয়ে কালকূট 'শাম্ব'কে চিত্রায়িত করেছেন আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে। পৌরাণিক পথে চলতে গিয়ে কালকূটরূপী সমরেশ বসু এক বিখ্যাত সংগ্রামী অভিযাত্রীকে প্রত্যক্ষ করেছেন। কালকূট বলেছেন ''শাম্ব আমার কাছে এক 'সংগ্রামী' ব্যক্তি, 'বিশ্বাস' এখানে আমার বক্তব্য বিষয়, এবং এক বিপন্ন ব্যক্তির উত্তরণকে শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখতে চেয়েছি, কালের মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে।— কালকূট, ১ বৈশাখ, ১৩৮৫।'' *(পৃ: ১৬৮৩, কালকূট রচনা সমগ্র ৩য় খণ্ড)*

শাম্ব লেখার আগে ১৯৭৭ খৃষ্টাব্দে সমরেশ বসু লিখেছিলেন 'মহাকালের রথের ঘোড়া'। নায়ক রুহিতন কুরমি কারাবাসের সময় শেষ করে তাঁর স্বভূমিতে ফিরে আসার পর রাজনৈতিক মতাদর্শে সংঘাত হয়েছিল। তার কুষ্ঠ হয়েছিল যা প্রতীকী সময়ের কালব্যাধি। বিনষ্ট নেতৃত্বে হৃতমূল্যবোধের সন্ধানে সে একক সংগ্রামী। শাম্বও উত্তরণের পথে একক সংগ্রামী। 'মহাকালের রথের ঘোড়া'-রই উত্তরসূরী 'শাম্ব' উপন্যাস। এই দুই উপন্যাসে সমরেশ বসু ও কালকূট হাত ধরাধরি করে কাহিনী দুটিকে একই কলমের দুটি ধারায় বইয়ে দিয়েছেন বাংলাসাহিত্যকে গৌরবান্বিত করেছেন। ১৯৮০ খৃষ্টাব্দে 'শাম্ব'র জন্য কালকূট 'সাহিত্য একাডেমী' পুরস্কারে পুরস্কৃত হয়েছিলেন।

১৯৬৪ তে শ্যালিকা ধরিত্রী দেবীকে বিয়ে করে বালিগঞ্জে স্টেশন রোডের ফ্ল্যাটে সংসার পেতেছিলেন। বালিগঞ্জের ঐ ফ্ল্যাটটিকে তিনি কিছুদিন আগেই কিনেছিলেন, কলকাতায় ওটাই ছিল লেখকের প্রথম আস্তানা। নৈহাটীর বাড়ির মত ওখানে তিনি প্রতিদিন নিয়ম করে লিখে যেতেন। দুপুরে কেউ তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা, গল্প-গুজব করতে গেলে নিজে আগেই বলে দিতেন — লিখছি যে। তিনি যে লেখাকে পেশা করেছিলেন; অতএব লেখার বিষয়ে তাঁর শৃঙ্খলাটি ছিল। এরপরে বালিগঞ্জ থেকে সর্কাস রেঞ্জের দোতলা ফ্ল্যাটে উঠে এসেছিলেন। এখানে আসার পর তিনি প্রথম হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। ডাক্তার দোতলায় ওঠা বারণ করেছিলেন একটু বেশি সাবধানতার জন্য। যোধপুর পার্কে কল্যাণ চৌধুরীর নতুন বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু সেইকালের বিখ্যাত সাহিত্যিক ওই ঘেরাটোপের মধ্যে বন্দী থাকতে পারেন নি। যোধপুর পার্কের বাড়িতেই ক'দিন বাদে ফিরে এসে 'শেকল ছেঁড়া হাতের খোঁজে', 'মহাকালের রথের ঘোড়া' ও

'টানাপোড়েন' এই উপন্যাসগুলোর পূর্ণতা দিয়েছিলেন। এদিকে কালকূট ইতিহাস-পুরাণ-মহাকাব্য বিষয়ক রচনায় মনোনিবেশ। মহাভারত বিষয়ক রচনাগুলো হল 'যুদ্ধের শেষ সেনাপতি' (১৯৮২) , 'পৃথা' (১৯৮৬), 'অন্তিম প্রণয়' (১৯৮৭), রামায়ণ বিষয়ক রচনা হল 'প্রাচেতস' (১৯৮৪)। ইতিহাস ও জীবনী বিষয়ক রচনাগুলো হল 'প্রেম কাব্য রক্ত' (১৯৮৭) ও 'জ্যোর্তিময় শ্রীচৈতন্য' (১৯৮৭)। এই রচনাগুলো প্রথমে ভ্রমর ছদ্মনামে প্রকাশিত হয়েছিল। পরে এগুলো কালকূট রচনাবলীর সঙ্গে সংযোজিত হয়ে যায়। কালকূটের রচনাগুলো তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হবে।

সমরেশ বসু একসময়ে কমুনিষ্ট আন্দোলনে বিশ্বাসী ছিলেন, কিন্তু সেই কমুনিষ্ট পার্টির মধ্যে তিনি মুক্তি খুঁজে পান নি। সেই ছাপ তার লেখায় পড়েছে। তিনি ক্রমশ গান্ধীবাদের দিকে আকর্ষণ বোধ করছিলেন। 'তিনপুরুষ' (১৯৮৬), 'খণ্ডিতা' (১৯৮৪) উপন্যাসের মধ্য দিয়ে তিনি তার গান্ধীবাদের আকর্ষণকে তুলে ধরেছেন।

ব্যক্তির জীবন ইতিহাসকে নিয়ে দীর্ঘ দশ বছরের পরিশ্রমে ভাস্কর 'রামকিংকর বেইজের' জীবনীমূলক উপন্যাস 'দেখি নাই ফিরে' লিখতে শুরু করেছিলেন 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে। এই উপন্যাসেই 'সমরেশ বসু' ও 'কালকূট' হাত ধরাধরি করে চলতে শুরু করেছিলেন কিন্তু অসমাপ্ত রয়ে গেল তাঁর সেই সাহিত্য কীর্তি। 'দেশ' সমরেশ বসু স্মরণে বিশেষ সংখ্যায় বোলান গঙ্গোপাধ্যায় 'প্রিয় লেখক সমরেশ বসু' তে 'দেখি নাই ফিরে' সম্পর্কে বলেছেন তাঁর শেষ এবং অসম্পূর্ণ লেখা 'দেখি নাই ফিরে' যখন থেকে দেশ-এর প্রকাশিত হয়েছে তাঁর অনেক আগেই এই উপন্যাসটি রচনার প্রস্তুতি পর্বের খানিকটা আমি প্রত্যক্ষ করেছি। কি অসম্ভব ধৈর্য আর নিষ্ঠা সেই প্রস্তুতিতে! ভেতরে ভেতরে অপেক্ষা করেছে সৃষ্টিশীল এক লেখক কিভাবে লিখবেন এই জীবনী-উপন্যাস। এখানে তথ্যে স্থির হতে হবে (অবশ্য সমরেশ সর্বদা তথ্যে স্থির) এবং সেইসঙ্গে আনতে হবে উপন্যাসের কল্পনার স্বাদ। কি দুঃসাধ্য সেই কাজ। রামকিংকরকেই বা তিনি বেছে নিয়েছেন কেন? নিজের শিল্পী-জীবনের কোন প্রতিফলন কি তিনি রামকিংকরের মধ্যে দেখেছিলেন? এখানেও কি ব্যক্তির স্বাধিকারের, তার নির্বাচনের মর্যাদার প্রশ্নটি ঘুরে আসছিল না? কোন একটি বিন্দুতে গিয়ে কি ভাস্কর রামকিংকর আর লেখক সমরেশ বসু মিলে যাচ্ছিলেন না? কেবলই কি রামকিংকরের জীবন নাট্যময় সংঘাতে পূর্ণ বলে তাঁর এই নির্বাচন? আমার তা মনে হয় নি। যেহেতু এই জীবনী-উপন্যাসের লেখক সমরেশ বস— তাই আমিও পেয়ে গেলাম আর এক আশ্চর্য জগতের খোঁজ। চণ্ডীনাপিতের ছেলে রামকিংকর জীবনে কখনও সমান ব্যবহার পান নি। "নাপিতের ছেলে" এই জাতপাতের কলঙ্ককে তাঁর শিল্প মুছে দিতে পারে নি। এই সংজ্ঞাটি তাঁর ভাস্কর হয়ে ওঠার পাশাপাশি থেকেছে। আজীবন। 'দেশ' এর পাতায় আমরা দেখেছি কী ভীষণ

নীরব নিষ্ঠুরতা তাঁকে ভোগ করতে হয়েছে।'' *(পৃ: ১৩৮)* আর ঐ 'দেশ' সমরেশ বসু স্মরণে, সংখ্যাটিতে মুক্তি রায় চৌধুরী 'স্মৃতির মালা'য় বলেছেন, 'সমরেশ মজুমদার'-এর আগে ওঁর রামকিংকরকে নিয়ে লেখাটি প্রকাশিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু শারীরিক কারণে সাহস পাননি, যদি নিয়মিত লেখাটি দিতে না পারেন; সমরেশ মজুমদারের লেখাটি শেষ হলেই ওঁর লেখাটি বেরুবে। হায়রে! আজ বড় আফসোস হচ্ছে তখন যদি আগে মজুমদার মহাশয়ের লেখাটি বেরুত তাহলে আমরা পরিপূর্ণ গ্রন্থটি পেতাম।' *(পৃ: ১৩৪)*

১৯৮৭-র ৩রা জানুয়ারী থেকে দেশ পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হতে থাকে এই উপন্যাসেই 'সমরেশ বসু' ও কালকূট হাত ধরাধরি করে চলতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু অসমাপ্ত রয়ে গেল তাঁর সে-ই সাহিত্য কীর্তি। ১৯৪৬ থেকে ১৯৮৮ পর্যন্ত দীর্ঘকাল সমরেশ বসু সাহিত্যকর্মের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিলেন। লেখাকেই তিনি জীবিকা করেছিলেন। এ'বিষয়ে সুব্রত মুখোপাধ্যায় স্মৃতিতর্পণ করেছেন তার 'জীবন বুনা কর'-এ 'কোনো বিশেষণ প্রয়োগের শৃঙ্খলিত অলংকার ব্যবহার না করেই বলা যেতে পারে একজন মানুষ নিজের হৃদপিণ্ড এবং অন্তঃকরণ নিজেরই হাতে নিঙড়ে মুচড়ে শুধুমাত্র এই একটি শিল্পকর্মের জন্য জীবনভর যুগপৎ স্বেচ্ছা যন্ত্রণা ও আনন্দ উপভোগ করেছেন। এ যাতনা ও সুখের প্রথম প্রত্যক্ষদর্শী ও প্রত্যক্ষমর্মী লেখক নিজেই।' *(পৃ: ১০৪, দেশ, সমরেশ বসু স্মরণে)*

যেহেতু সমরেশ বসু লেখাকেই জীবিকা হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন, সেইহেতু তাঁর গ্রন্থের সংখ্যাও অনেক। প্রায় পৌনে তিনশোর মত। যে কয়েকটি উপন্যাসের কথা আলোচনায় উঠে এসেছে সেগুলো ছাড়া সমরেশ বসুর আর কিছু বিশেষ বিশেষ গ্রন্থ হলো — 'ছিন্নবাধা' (১৯৬২) , 'শেষ দরবার' (১৯৬৩), 'তিন ভুবনের পারে' (১৯৬৬), 'আত্মজ' (১৯৬৭), 'অপরিচিত' (১৯৬৮), 'এপার ওপার' (১৯৬৮), 'পাতক' (১৯৬৯), 'যাত্রিক' (১৯৭০), 'যার যা ভূমিকা' (১৯৭০), 'ছুটির ফাঁদে' (১৯৭০), 'সওদাগর' (১৯৭১), 'রক্তিম বসন্ত' (১৯৭১), 'বিকালে ভোরের ফুল' (১৯৭২), 'ওদের বলতে দাও' (১৯৭২), 'পরম রতন' (১৯৭৩), ত্রিধারা (১৯৭৩) , 'প্রাচীর' (১৯৭৩), 'অবশেষে' (১৯৭৩), 'নাটের গুরু' (১৯৭৫), 'সবুজ বনে আগুন' (১৯৭৫), 'সংকট' (১৯৭৬), 'সূর্যতৃষ্ণা' (১৯৭৬), 'বারো বিলাসিনী' (১৯৭৬), 'গন্তব্য' ((১৯৭৮), 'শেষ অধ্যায়' (১৯৭২), 'বিপর্যস্ত' (১৯৮০), 'অস্বীকার' (১৯৮১), 'হত্যারহস্য' (১৯৮২), 'বিজন বিভূঁই' (১৯৮৩), 'অভিজ্ঞান' (১৯৮৪), 'বাথান' (১৯৮৫), 'জবাব' (১৯৮৬), 'আদি মধ্য অন্ত' (১৯৮৭), 'মোহমায়া' (১৯৮৮) ইত্যাদি ইত্যাদি।

এছাড়া অসামান্য দক্ষতায় বাহুল্যহীন, এক বগ্গা, অলঙ্কারবিহীন অসংখ্য ছোট গল্প লিখে গেছেন। যার মধ্যে কিছু কিছু ছোট গল্প বিশ্বমানে পৌঁছে গেছে। 'দেশ', 'সমরেশ বসু স্মরণে'

সংখ্যায় আনন্দ বাগচী বলেছেন তার সমরেশ বসু কাগজে কলমে কাটাকুটি বা ঘষামাজা কম করতেন। সে কাজটা হত মুখে মুখে। 'হঠাৎ আলোর ঝলকের মত সমরেশের মাথায় কোন গল্প খেলে যাবার পরই তিনি তাকে মাথার মধ্যে সাজিয়ে নিতেন। তারপর মুখে মুখে গল্পটা বলে যেতেন। গল্প পাঠের মতই গল্প বলার আর্টও ছিল সমরেশের অসামান্য। এই বলতে বলতেই তাঁর গল্পে পালিশ ধরত, গল্পটি সম্পূর্ণ হয়ে উঠত। অক্লান্ত কথক সমরেশ প্রয়োজনবোধে একটি গল্পকে চার পাঁচবারও শুনিয়েছেন বিভিন্ন শ্রোতার সামনে। সেই একাধিক বৈঠকে হাজির থাকার সৌভাগ্য যাদের হয়েছে তাঁরাই গল্পের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবর্তন লক্ষ করেছেন। এইভাবে গল্পটি তৈরী হয়ে যাবার পর এক বৈঠকে কিংবা এক ঝোঁকে সেটা লিখে ফেলতেন। কান দিয়ে দেখা আর চোখ দিয়ে শোনার কাজটি এই দুই দফায় ঘটে যেত। মৌখিক গল্প রচনার ফলে লেখার মধ্যে একটা সাবলীল স্বতঃস্ফূর্তি এবং অন্তরঙ্গ স্টাইল ফুটে বেরতো। অসাধারণ স্মৃতিশক্তি না থাকলে একটা গল্পের পাণ্ডুলিপি কেউ এভাবে মগজে তুলে রাখতে পারে না।' তার উল্লেখযোগ্য ছোটগল্পগুলো হলো — আদাব (১৯৪৬), উরাতীয়া (১৯৫৪), উত্তাপ (১৯৫৬), ছেঁড়া তমসুক (১৯৭১), হ্রেষাধ্বনি (১৯৭৩), আলোর বৃত্তে (গল্প সংগ্রহ, প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৩৮৮ (মে ১৯৮১), পার, পসারিণী, শানা বাউরীর কথকতা, ৭৮ দিন পরে, স্বীকারোক্তি, শিকল পরার ছল (বাছাই গল্প, প্রথম প্রকাশ আশ্বিন ১৩৯২ (অক্টোবর ১৯৮৬) ইত্যাদি। তাছাড়া কিছু গল্প লিখেছেন ছোটদের জন্য — 'শিমূলগড়ের খুনে ভূত' (১৯৮০), 'গোগোল চিক্কুস নাগাল্যান্ডে' (১৯৮৩), 'জঙ্গলমহলে গোগোল' (১৯৮৭), 'বিদেশী গাড়িতে বিপদ' (১৯৮৮) ইত্যাদি।

ব্যক্তিজীবনে সমরেশ বসু তাঁর সাহিত্যে যে ভাষা ও ভাষ্যের সৃষ্টি করেছিলেন তা নিয়ে অনেক তর্ক-বিতর্ক হয়েছে। শ্লীল-অশ্লীলতা নিয়ে পাঠকমহলে, বিদগ্ধ মহলে অনেক ঝড় উঠেছে, তবু তিনি ক্ষান্ত হন নি। নিজ বিশ্বাসে অটল থেকেছেন। তিনি সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে নানাবিষয়ে তার গল্পের উপাদান সংগ্রহ করে তাঁর সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। তাঁর অনমনীয় আত্মবিশ্বাসই তাঁকে সাফল্যের সিংহদুয়ারে পৌঁছে দিয়েছে। আর ছদ্মনাম 'কালকূট'-এর লেখাগুলো গভীর ব্যঞ্জনাময় ও অর্থবহ যা বাংলাসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। বাংলাসাহিত্যে তিনি ছিলেন মহীরুহ সদৃশ এই বিরাট প্রতিভাকে হঠাৎই চলে যেতে হয়েছে পৃথিবীর মায়া ছেড়ে। বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের মধ্যে স্বীকৃত শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক সমরেশ বসু তথা কালকূট ১৯৮৮-এর ১২ই মার্চ ইহলোক ত্যাগ করলেন। জীবন শুরু হয়েছিল ঢাকায় মামার বাড়ি থেকে, ১৯২৪-এ ১১ই ডিসেম্বর থেকে। এই বিরল প্রতিভার প্রয়াণে পাঠককুলকে গুণীজন, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয় পরিজন সব শোকস্তব্ধ। ২৫শে ফেব্রুয়ারী ভুবনশ্বেরে গিয়েছিলেন অসুস্থ শরীরে। বরেন্দ্রকৃষ্ণ বলকে কথা দিয়েছিলেন বলেই অসুস্থ শরীরে পত্নী ধরিত্রী বসু ও ডঃ কল্যাণ বসুকে নিয়ে মুখ্য অতিথি

হিসাবে ভুবনেশ্বরে গিয়েছিলেন ২৬শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮৮ বইমেলার উদ্‌ঘাটন উৎসবে। এ সম্পর্কে বরেন্দ্রকৃষ্ণ ধল স্মৃতি তর্পণ করেছেন এইভাবে 'সেইদিন শাম্ব উপন্যাসের ওড়িয়া ভাষান্তর ওর উপস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রী উদ্‌বোধন করলেন। আমি 'শাম্ব' বইয়ে যে ভূমিকা লিখেছিলাম তাঁর বাংলা অনুবাদ উনি চেয়েছিলেন। ওটা আমি ভুবনেশ্বরে ওঁকে দিয়েছিলাম। উনি পড়ে একটু হাসলেন এবং বললেন, তুমি আমাকে অনেক উঁচুতে নিয়ে গেছো, সেটা সম্ভবত আমার প্রাপ্য নয়।'' *(পৃ: ১৩০, দেশ, সমরেশ বসু স্মরণে)* ভুবনেশ্বরে থাকার সময়েই ওঁনার শ্বাসকষ্ট বেড়ে যাওয়ায় প্লেনের টিকিট ক্যানসেল করতে হয়েছিল। পরে ২৯শে ফেব্রুয়ারীতে কলকাতার পথে রওনা দিয়েছিলেন। বিমানবন্দরে বরেন্দ্রকৃষ্ণ ধলকে বলেছিলেন 'তুমি কলকাতায় এলে আমার সঙ্গে দেখা করবে! নিশ্চয়ই এসো।

তখন ভাবতেও পারি নি, এই শেষ দেখা। ভুবনেশ্বরের বইমেলাতেই তিনি শেষ প্রকাশ্যে বক্তৃতা দিলেন, সেদিন তোলা ছবিটিই সম্ভবত তার শেষ ছবি।'' *(পৃ: ১৩০, দেশ, সমরেশ বসু স্মরণে)* বাংলা কথাসাহিত্যের উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব এরপর অকালেই চলে গিয়েছিলেন। দেশ পত্রিকার ২রা এপ্রিল ১৯৮৮-র সংখ্যায় 'দেখি নাই ফিরে' ধারাবাহিক উপন্যাসটি পঁয়ষট্টি নং অধ্যায়ে 'দেখি নাই ফিরে' শিরোনামের দক্ষিণে বক্রভাবে লেখা হয়েছে 'এই লেখা তার শেষ হল না'। রামকিংকর বেইজের জীবনীমূলক উপন্যাস লেখাটাকে সমরেশ বসু তথা কালকূট ধ্যান জ্ঞান করেছিলেন। পাখির চোখের দিকে চোখ রেখে লক্ষ্যে পৌঁছাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পারলেন না। সমরেশ বসু ও কালকূট হাত ধরাধরি করে চলতে গিয়ে হঠাৎই থেমে পাড়ি দিলেন অজানায়।